~~Senior~~

~~4531~~

~~1026~~

~~4531~~

হাজি মুরাদ

লিও তলস্তয়

অনুবাদ :
প্রফুল্ল চক্রবর্তী

কলিকাতা পুস্তকালয় লিমিটেড

৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

—বাদল ও বুলুকে—

দাম সাড়ে তিন টাকা

কলিকাতা পুস্তকালয় লিমিটেড থেকে শ্রীমণীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী প্রকাশ করেছেন। শ্রীঅরুণ দাস ছবি এঁকেছেন। ২০৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, **লক্ষ্মী সরস্বতী প্রেস** থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পান ছেপেছেন। বই বেঁধেছেন ভ্যারাইটি বুক বাইণ্ডার।

তলস্তয়-প্রসঙ্গে

অতি পরিচিত নাম। দূরদেশের মানুষ, তবু নেহাৎ পরিচিত বলে মনে হয়। সাহিত্যের সার্বজনীন আবেদন দেশ-কাল-পাত্রের সীমা লঙ্ঘন করে বিশ্বের কলারসিকজনের সঙ্গে এই সাহিত্যরথীর আত্মীয়তার সেতু-বন্ধন করেছে।

রুশ জীবন ও রুশ পরিবেশের ভিত্তিতে মানব চরিত্র চিত্রনে তল-স্তয়ের শক্তিমান লেখনী আর অনন্যসাধারণ মুন্সিয়ানা শুধু সমকালীন রুশ সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব সাহিত্যের দিক্‌পালদের আসরে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর প্রতিভা স্বচ্ছন্দে এমন সু-উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারত যে তাঁর সৃষ্টি সারা দুনিয়ার উপন্যাস সাহিত্যের সামনের সারিতে স্থানলাভের যোগ্য; এমনকি তার সাহিত্য-সৃষ্টিকে মানব জাতির শিল্প প্রতিভার অগ্রগতির এক সুস্পষ্ট পদক্ষেপ বলে অভিনন্দিত করা যায়।

রুশ দেশের তুলা শহরের কাছাকাছি ইয়াসনয়া পলিয়ানায় ১৮২৮ সালে তার জন্ম হয়। শৈশবে বাবা-মা হারিয়ে আত্মীয়ের বাড়ীতেই তিনি বড় হন। জীবনের অধিকাংশ সময় তার জন্মস্থানে কেটেছে। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে স্নাতক উপাধি নেবার আগেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নেন। সেকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর অর্থহীন বলে মনে হয়েছে। জন্মভূমিতে ফিরে তিনি স্থানীয় চাষীদের দুর্দশা-মোচনে ব্রতী হন—সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনাও চলে।

তারপর ১৮৫২ সালে স্বেচ্ছাসৈনিক হিসাবে তিনি ককেসাসের যুদ্ধে যোগ দেন। সেখান থেকে রুশ সেনা বাহিনীর সঙ্গে তাঁকে দানিউব অঞ্চলে পাঠান হয়। এখান থেকে আবার বদলী হলেন

ক্রাইমিয়ায়। বিখ্যাত সেবাস্তপলের দুর্গ-রক্ষার যুদ্ধে তিনি যোগ দিয়েছিলেন।

সামরিক জীবনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা উত্তরকালের সাহিত্য সৃষ্টিতে তাকে প্রচুর মাল-মসলা যোগান দিয়েছে। ভেরী নিনাদ, জয়োল্লাস কিংবা অশ্বারূঢ় সেনাপতির বলদর্পী চালচলন তাকে মুগ্ধ করতে পারেনি। যুদ্ধের আসল রূপ ধরা পড়েছে তার চোখে। তিনি দেখেছেন রক্তপাত ক্লেশ ও মৃত্যুর বিভীষিকার দৃশ্য।

১৮৫৫ সালে রাজধানী পেতরবুর্গে তলস্তয় সর্বপ্রথম সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। তৎকালীন রুশ-সাহিত্যের দিক-পালদের অনেকের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে এবং মানুষ ও শিল্পী হিসাবে তাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

সামরিক জীবন থেকে অবসর নিয়ে ১৮৫৬ সালে তিনি মাস ছয়েকের জন্য বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। সাড়ে তিন বছর পরে আর এক-বারও জার্মানি, ইতালি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড ঘুরে আসেন।

তলস্তয় দেশে ফিরবার আগেই রাশিয়ায় ভূমিদাস-প্রথা লোপ করা হয়; কিন্তু চাষীর দুর্দশা ঘোচে না। সরকারী সালিশের কাজ নিয়ে তিনি নিজের এলাকার চাষীদের সেবায় ব্রতী হলেন; কিন্তু বছর খানেক পরেই স্থানীয় অভিজাতদের বিরোধিতায় তাকে পদত্যাগ করতে হয়। তখন তিনি চাষীর ছেলেদের জন্য এক স্কুল খোলেন।

১৮৬২ সালে মস্কোর এক ডাক্তারের মেয়ে সোফিয়া আন্দ্রিয়েভনা বেরসের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। সেই থেকে সংসার আর সম্পত্তির কাজেই তিনি ব্যাপৃত থাকেন। তবে অক্লান্ত সাহিত্য সৃষ্টির কোন ব্যাঘাত হল না। মৃত্যুর (১৯১০) দশ দিন পূর্বে পর্যন্ত মোটামুটি এই খানেই তিনি জীবন কাটিয়েছেন।

সুদীর্ঘ জীবনে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে প্রচুর লিখে গেছেন তলস্তয়। উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে তার বিচিত্র বহুমুখী সাহিত্যিক অবদান। তার 'ওয়ার এণ্ড পীস' সেরা উপন্যাসের সেরা বলে আজও সর্বদেশে স্বীকৃত। তার পরেই নাম করতে হয় তার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি 'আন্না কারেনিনার'। এ ছাড়া 'রিজারেকশন,' 'কজাকস', 'হাজি মুরাদ' প্রভৃতি আরও বহু উপন্যাসের নাম করা যায় যা তলস্তয়ের অসামান্য প্রতিভার বিস্ময়কর খণ্ড-প্রকাশ বলে সমাদর লাভের দাবী রাখে।

তার দৃষ্টিতে জীবন ও আর্টের পার্থক্য অতি সামান্য। মানব চরিত্রের গূঢ়-রহস্য সম্পর্কে গভীর অন্তদৃষ্টি থাকলেও নিজের সৃজনী কলা-কৌশল সম্পর্কে তিনি তেমন সচেতন ছিলেন না। তাই তাঁর উপন্যাস কলা-কৌশলের চাতুরীর পরিবর্তে জীবন ও আর্টের অভিন্নতায় প্রোজ্জল। একদিক থেকে একথাও বলা যায় যে, তলস্তয়ের উপন্যাসে কোন পূর্ব-কল্পিত ছক নেই। তার উপন্যাস জিজ্ঞাসার অতীত অপরিবর্তনীয় জীবন ধারার বিকাশের বিস্ময়কর প্রকাশে উচ্ছল। তথাকথিত বাছাই করা উদ্দেশ্যমূলক ঘটনা আর নাটকীয় পরিস্থিতির সমাবেশে তার উপন্যাস কখনও চমক লাগাবার প্রয়াস পায়নি। তাছাড়া নিজের রচনা-রীতি সম্পর্কেও তিনি তেমন সচেতন নন। কষ্টকল্পিত বাক-বিন্যাসের দিকে তাঁর কোন ঝোঁক ছিল না; বরং তাকে চটকদার ভাষার চাতুরীর বিরোধী বলা যায়।

তাছাড়া সাহিত্য সম্পর্কে তার মনোভাবও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত। আমরণ নিজেকে তিনি সাহিত্য থেকে বিশ্লিষ্ট করে রেখেছেন। বলতেন, আমি সাহিত্য সেবী কিন্তু অভিজাত সাহিত্যিক নই। সগর্বে নিজেকে আর লেরমন্তভকে তিনি সমকালীন 'সাহিত্যিক গোষ্ঠী' থেকে বাদ

দিয়েছেন। গর্কি লিখেছেন যে কদাচিৎ তিনি সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতেন—'এ জিনিস যেন তার ধাতের বাইরে।'

তুর্গেনিভের সঙ্গে বহুদিন তাঁর সদ্ভাব ছিল না। তারপর ১৮৮০ সালে ইয়াসনয়া পলিয়ানায় তলস্তয়ের সঙ্গে দেখা করে তুর্গেনিভ লেখেন: আমাকে শিল্পী বলে গণ্য করা হয়; কিন্তু তার তুলনায় আমি কি? সমকালীন ইয়োরোপীয় সাহিত্যে তিনি অদ্বিতীয়।......কিন্তু তাকে নিয়ে কি করা যায়? আর এক কর্মক্ষেত্রে তিনি আকণ্ঠ ডুবে আছেন। সব ভাষার বাইবেল জড়ো করে নিজেকে ঘিরে রেখেছেন আর তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই লিখছেন।

হাঁ, সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা তলস্তয়ের জীবনের মূখ্য লক্ষ্য ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন খ্রীস্টান ধর্মের ভিত্তিতে যুগোপোযোগী এক মানব-ধর্মের প্রবর্তক হতে। ধনতান্ত্রিক সমাজ জীবন, সরকারী গীর্জা, জারের স্বৈরাচার আর দারিদ্র্য ও নিঃস্বতারজনক সামাজিক ব্যবস্থাকে তিনি তীব্র কশাঘাত হেনেছেন—অকুণ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন তার বিরুদ্ধে। কিন্তু তার এ প্রতিবাদের মূলে আছে তার নৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদ। সমাজ বিবর্তনের বাস্তব নিয়ম তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি।

'রিজারেকশন' উপন্যাসে সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ শাণিত হয়ে উঠেছে সব চাইতে বেশী। হাজি মুরাদ উপন্যাসেও অভিজাত সম্প্রদায় আর শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তার কঠোর সমালোচনা সুপ্রকাশ। এই উপন্যাসের বিদ্রোহী স্বাধীনতা-প্রিয় পাহাড়িয়ার চরিত্রটি তিনি এমন দক্ষতা ও দরদ নিয়ে এঁকেছেন যে মনে হয় যেন অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি তার অহিংস প্রতিরোধের মতবাদ বর্জন করেছেন।

তলস্তয়ের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তার প্রতিভার মানদণ্ডেই নিরুপণ করা যায় না। শিল্পের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে মহান উপলব্ধি এবং নিজের

জীবনে এই আদর্শ কার্যকরী করার নিষ্ঠা তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সাহায্য করেছে।

শিল্পী ও চিন্তানায়কদের কর্তব্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : চিন্তা-নায়ক আর শিল্পী কখনও নিশ্চিন্তে সু-উচ্চ পর্বতচূড়ায় বসে থাকতে পারে না……শংকা, সন্দেহ সব সময় তাকে আলোড়িত করে। এমন কথা সে বলতে পারে যা মানুষের মঙ্গলকর হবে, তাদের দুঃখমোচন করবে—দুর্দশায় সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু সে কথা আজ হয়ত সে বলল না—যথাযথভাবে হয়ত নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারল না, কাল আর সে সুযোগ নাও জুটতে পারে—সে মারাও যেতে পারে।……কোন চিন্তা-নায়ক বা শিল্পীই নিশ্চিন্ত আরাম-প্রিয় বা খেয়ালি নন।

আর শিল্পীর লক্ষ্য সম্পর্কে তার বক্তব্য হচ্ছে : সাধারণ মানুষের অনুভূতির অগোচর বিশ্বজনীন রহস্য জানতে হবে শিল্পীকে। এজন্য অবশ্যই তাকে সমকালীন সুশিক্ষিতদের অন্যতম হতে হবে—কিন্তু আত্মম্ভরিতায় সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে চলবে না। মানুষের সুখ-দুঃখের সমমর্মী হতে হবে তাকে—নিজের শিল্প করায়ত্ত করতে হবে। আত্মসমালোচনা করে কঠোর শ্রম করতে হবে এজন্য। তাছাড়া নিজে যে সম্পর্কে উদাসীন সে-বিষয়ে কখনও বক্তব্য জানাতে নেই; অন্তরের প্রেরণা যখন দুর্বার হয়ে উঠবে—আর যখন বক্তব্য চেপে রাখা যাবে না বলে মনে হবে, শুধুমাত্র তখনই লেখনী ধারণ করতে হবে।

নিজেও এ নিয়ম আজীবন পালন করেছেন তলস্তয়। নিজে যাকে যুগ-সমস্যা বলে মনে করতেন, শুধু মাত্র সেই সম্পর্কেই তার বক্তব্য জানিয়েছেন। আর, একবার লেখা হয়ে গেলে আবার তাই সংশোধন পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করে নতুন করে লিখেছেন। বলতেন, নিজে যা

বুঝেছ এমন ভাষায় তা প্রকাশ কর যাতে পাঠকেরাও তোমার বক্তব্য তোমারই মত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।

আমৃত্যু তিনি জনতার পাশাপাশি রয়ে গেছেন—তাদের ভাল বেসেছেন, সেবা করেছেন—শ্রদ্ধা করেছেন। তাদের সংশোধন করেছেন শিল্পী ও শিক্ষক হিসাবে—সালিশ ও সংগঠন রূপে সাহায্য করেছেন বুভুক্ষু কৃষকদের।

বরাহ নগর
১৯. ৫. ৫৪.

প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

মাঠ থেকে বাড়ী ফিরছি। তখন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। খড় কাটা শেষ হয়ে গেছে। রাই-কাটা শুরু হয়েছে মাত্র। অফুরন্ত ফুল ফোটে এ সময়ে। কত বিচিত্র তার রঙ আর কি অনুপম বাহার! গন্ধভরা ত্রিপত্র ক্লোভারগুচ্ছের কোনটা সাদা, কোনটা লাল, কোনটা বা গোলাপী। মধুর উগ্রগন্ধী দুধের মত সাদা বড় বড় ডেইসি ফুলগুলোর গর্ভকেন্দ্র উজ্জ্বল হলদে। মধুগন্ধী রেপ (১) মকুলগুলোও হলদে রঙের। লম্বা ক্যাম্পানুলা গাছের সাদা ও ফিকে বেগনি ফুলগুলো ঘণ্টার মত, অনেকটা টিউলিপের (২) ধরণের। বুকে-হেঁটে এগোচ্ছে মটর কলাইর ডগা। স্কেবিয়াসের (৩) ফুল কোনটা সাদা কোনটা হলদে আবার কোনটা গোলাপী। সুন্দরভাবে সাজান টকটকে লাল প্লানটিন (৪) লতার মুকুলে ঈষৎ গোলাপী

---

(১) ভেড়ার খাদ্যোপযোগী এক রকম ঘাস। (২) বিচিত্র রঙের ঘণ্টার মত ফুলের গাছ। (৩) পিনকুশনের মত বুনো এক রকম ফুলের গাছ। (৪) চওড়া চ্যাপ্টা পাতাওলা এক ধরণের লতা। পাতাগুলো মাটির লাগোয়া ছড়ান থাকে।

আভা। সদ্য-ফোটা কর্ণফ্লাওয়ারের (৫) কুঁড়ি উজ্জ্বল নীল, কিন্তু দিনান্তে কিম্বা বুড়িয়ে গেলে মলিন ও লালচে হয়ে যাবে। বাদামগন্ধী নরম ডডার (৬) ফুলগুলোও বড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। ফুল তুলে আমি বেশ বড় একটি তোড়া বানালাম। বাড়ী ফিরবার পথে একটা খানার মধ্যে লাল রঙের একটি থিসল্ গাছ চোখে পড়ে। এ অঞ্চলের লোকে এই কাঁটা গাছটিকে 'তাতার' নামে ডাকে এবং লাঙল দেবার সময় সামনে পড়লে এড়িয়ে যায়, কিম্বা কেটে ফেললেও হাতে কাটার ফোঁড় লাগার ভয়ে দূরে ফেলে দেয়। থিসল্ ফুল তুলে তোড়াটির মাঝখানে দেবার আশায় আমি খানার মধ্যে নামলাম। মধুর সন্ধানে এসে একটি কালো ভ্রমর পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলটির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভ্রমরটিকে তাড়িয়ে দিয়ে ফুলটি তুলতে গেলাম। কিন্তু ছিঁড়ে আনতে বেশ বেগ পেতে হল। বোঁটার চারদিকে শুধু যে কাঁটাই আছে তা নয়, তাছাড়াও বোঁটাটা এত শক্ত যে প্রতিটি আঁশ ছিঁড়ে ফুলটি তুলে আনতে মিনিট পাঁচেক সময় লেগেছিল। হাত অবশ্য রুমাল দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছিলাম। শেষ অবধি তুলে এনে দেখি, বোঁটাটা থেতলে গেছে আর ফুলটিও তেমন টাটকা বা সুন্দর নেই। আমার নরম ফুলের তোড়ার মধ্যে এই পুরু শক্ত ফুলটি ঠিক খাপ খাচ্ছিল না। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। ভাবলাম, যথাস্থানে যে জিনিস এত

---

(৫) শস্যের মধ্যে ভুঁইফোড় যত ফুলের গাছ জন্মায় তাদের নাম।

(৬) পত্রহীন এক প্রকার সূতোর মত সরু পরগাছা লতা।

সুন্দর, অকারণ খেয়ালের মাথায় কেন তাকে তু'লে আনলাম? দুঃখু হল।

ফুলটি তুলতে যে মেহনত লেগেছিল তার কথা ভেবে আপনমনে বল্লাম, কি অদ্ভুত শক্তি! কি বিস্ময়কর দৃঢ়তা! কেমন দৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষা করল! জীবন দিল বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে কম মূল্য নেয়নি!

সদ্য-চষা কালো মাটির জমির মধ্য দিয়ে বাড়ী যাবার পথ। ধূলোভরা পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। চষা জমির মালিক এক জমিদার। জমিটি এত বড় যে আমার দুপাশে এবং সামনে পাহাড় অবধি সমতল লাঙল-দেওয়া ভিজা মাটি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। জমিটি চাষ করা হয়েছে; কালো মাটি ছাড়া কোথাও এক কুচি ঘাস বা আগাছা দেখা যায় না। এই নিষ্প্রাণ কালো জমির দিকে চেয়ে আপনা থেকেই মনে হল, কি অদ্ভুত প্রাণঘাতী জীব মানুষ! নিজেদের প্রাণধারণের জন্য কত লক্ষ লক্ষ গাছপালার প্রাণই যে নাশ করে! সামনে ডানদিকে আর একটি ঝোঁপ নজরে পড়ল। এগিয়ে দেখি, একই ধরণের আর একটি থিসল্ গাছ রয়েছে। এই 'তাতার' গাছটির তিনটি শাখা। একটি শাখা ভাঙা, কাটা হাতের মত উঁচিয়ে আছে। আর দুখানি ডালেই একটি করে ফুল। এক সময় লাল ছিল, কিন্তু এখন কালচে হয়ে গেছে। ফুলের বোঁটাটা ভাঙা। সেই ভাঙা বোঁটায় একটি নোংরা ফুল ঝুলছে। দ্বিতীয় ফুলটি কালো কাদা মাখা হলেও খাড়া হয়ে উন্নতশিরে দাঁড়িয়ে আছে। স্পষ্টই

বোঝা যায় যে, গাছটির উপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলে গেছে। তবু আবার মাথা খাড়া করেছে গাছটি। আর সেই জন্যই খাড়া হলেও ঈষৎ হেলে গেছে। মনে হয় যেন ওর অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে, নাড়িভুঁড়ি বার করা হয়েছে যেন, একখানা হাত বুঝি কেটে ফেলা হয়েছে···উপড়ে ফেলা হয়েছে একটা চোখ। তবু তার শির উন্নত আছে। যে মানুষ তার চার পাশের ভাইয়েদের ধ্বংস করেছে, তার কাছে সে নতি-স্বীকার করেনি।

ভাবলাম, কি অফুরন্ত জীবনীশক্তি! মানুষ সব কিছু জয় করেছে, লক্ষ লক্ষ গাছপালা ধ্বংস করেছে, তবু এটি নতি-স্বীকার করেনি!

এই প্রসঙ্গে বহু বছর আগেকার একটি ককেসীয় কাহিনী মনে পড়ে গেল। সে ঘটনার কিছু কিছু আমি প্রত্যক্ষ করেছি, কিছু শুনেছি প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে, আর কিছুটা কল্পনা করে নিয়েছি।

আমার স্মৃতি ও কল্পনায় কাহিনীটি যে রূপ পায় তার কথা বলছি।

আঠারোশ একান্ন সালের শেষাশেষি ঘটনাটি ঘটে।

নভেম্বর মাস। বেশ ঠাণ্ডা। একদিন সন্ধ্যার মুখে ঘোড়ায় চড়ে হাজি মুরাদ শত্রুপক্ষীয় চিচেনদের আউল (১) মখমদে আসে। পোড়া কিজ্যাকের (২) গন্ধমাখা ধোঁয়া ভরতি পল্লীটি রুশ সীমান্ত থেকে মাইল পনেরো দূরে। সাকলাগুলো (৩) মৌচাকের খোপের মত ঘিঞ্জি। মোয়াজ্জেনের আজান সবে থেমেছে; গরু ছাগল ফিরে আসছে গৃহস্থের ঘরে। গরুর হাম্বারব এবং ছাগলের ম্যা ম্যা ডাকের মধ্যেও ঘুঁটের ধোঁয়া ভারাক্রান্ত ফুরফুরে পাহাড়ে হাওয়ায় পুরুষের তর্ক-বিতর্কের কর্কশ ঘড়ঘড়ে আওয়াজ স্পষ্টই কানে আসে। মেয়েদের গলা আর শিশুর কলরব উঠছে নীচুর ঝরণার কাছাকাছি থেকে।

শামিলের নায়েব ছিল হাজি মুরাদ। কীর্তি-কলাপের খ্যাতিও প্রচুর। কয়েক ডজন মুরিদ (৪) এবং নিজের নিশান সঙ্গে না নিয়ে আগে সে বেরোয় নি। ঘোড়ায় চড়ে লোক দেখান চালে মুরিদরা একেবেঁকে চলত আগে আগে। আজকে সেই লোক পলাতক। ঘোড়ায় চড়ে এ গাঁয়ে এসেছে বোরকা

---

(১) আউল: তাতার গ্রাম।

(২) কিজ্যাক: খড় ও গোবর দিয়ে তৈরী ঘুঁটে।

(৩) সাকলা: ককেসীয় কুঁড়ে। মাটির প্রাচীর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাটির ঘর।

(৪) মুরিদ: অনুচর বা শিষ্য।

মুড়ি দিয়ে। রাইফেলটা উঁচিয়ে আছে ঢাকনির তলায়। সঙ্গে একটিমাত্র মুরিদ। আজকে সে যতটা সম্ভব দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে চায়। পথে যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, হুঁশিয়ার কালো চোখ কুঁচকে তার মুখের দিকেই চেয়েছে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে।

গাঁয়ে ঢুকে খোলা স্কোয়ারে যাবার পথ ছেড়ে সে বাঁয়ে মোড় ঘুরে একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়ে এবং পাহাড় কেটে তৈরী করা দ্বিতীয় সাকলাটির কাছে থেমে চারিদিকে তাকায়। বাইরের ঘরে লোকজন নেই। কিন্তু সাকলার চালে সদ্য লেপ দেওয়া মাটির চিমনির পেছনে ভেড়ার ছাল মুড়ি দিয়ে একটি লোক পড়ে আছে। চামড়ায় মোড়া চাবুকের বাঁট দিয়ে লোকটিকে সন্তর্পণে খোঁচা মেরে হাজি মুরাদ জিভে টক্ টক্ শব্দ করে। ভেড়ার ছালের ঢাকনি সরিয়ে তেল চিট্‌চিটে পুরনো বেশমত (৫) এবং কুল্লা পরা এক বৃদ্ধ তখন মাথা উঁচু করে। লোকটির ভেজা লাল চোখের পাতা পক্ষ্মহীন। চোখ খুলবার জন্য বার কয়েক সে পিটপিট করে। 'সালাম আলাইকুম' বলে হাজি মুরাদ মুখের ঢাকনা সরিয়ে দেয়। আগন্তুককে চিনতে পেরে ফোকলা মুখে হেসে 'আলাইকুম সালাম' বলে বৃদ্ধও প্রতি-সম্ভাষণ জানায়। লিকলিকে শীর্ণ পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ তখন কাঠের গোড়ালির চটিতে পা ভরে। চটি জোড়া চিমনির পাশেই ছিল। তারপর কোঁচকান ভেড়ার ছালের হাতায় হাত ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে চালে হেলান

(৫) বেশমত : হাতওলা এক ধরণের তাতার জামা।

দেওয়া মই'র কাছে যায়। পেছনের দিকে নেমে যায় লোকটি। পোশাক পরবার সময় এবং নামতে নামতে চামড়া কোঁচকান সরু রোদে-পোড়া ঘাড় নেড়ে ফোকলা মুখে লোকটি বিড়বিড় করে কি যেন বলে। মাটিতে নেমেই আতিথেয়তার রীতি অনুসারে এগিয়ে এসে বৃদ্ধ হাজি মুরাদের বলগা এবং ডান রেকাব ধরে। কিন্তু জওয়ান চটপটে মুরিদটি ইতিমধ্যেই নেমে পড়ে এবং বুড়োকে সরে যাবার ইঙ্গিত করে তার স্থান নেয়। হাজি মুরাদ তখনই চটপট ঘোড়া থেকে নামে এবং ঈষৎ পা টেনে বাইরের ঘরের চালের নীচে ঢোকে। অমনিই বছর পনেরোর একটি ছেলে হন্তদন্ত হয়ে দরজার বাইরে এসে তাকে অভ্যর্থনা করে। পাকা শ্লো ফলের মত কালো উজ্জ্বল চোখে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে আগন্তুকদের দিকে।

মসজিদে দৌড়ে গিয়ে বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়। বৃদ্ধ হুকুম করে এবং নিজে চটপট এগিয়ে গিয়ে সাকলার পাতলা কচমচে কপাট খুলে দেয়।

হাজি মুরাদ সদর দরজা পার হতে না হতেই হলদে শেমিজ লাল বেশমত আর ঢিলে নীল পাজামা পরা ছিপছিপে কৃশ একটি মাঝারি বয়সের স্ত্রীলোক কুশন নিয়ে ভেতরের দরজা দিয়ে ঢোকে।

আপনার আগমন শুভ হোক! স্ত্রীলোকটি বলে এবং অতিথিদের বসবার জন্য সামনের দেয়ালের পাশে নীচু হয়ে কুশন সাজিয়ে দেয়।

আপনার ছেলের মঙ্গল হোক। হাজি মুরাদ প্রতি-সম্ভাষণ জানায় এবং বোরকা, রাইফেল, তরোয়াল খুলে বৃদ্ধের হাতে দেয়। বৃদ্ধ সেগুলো নিয়ে গৃহকর্তার হাতিয়ারের পাশে সযত্নে পেরেকে ঝুলিয়ে রাখে। মাটির লেপ দেওয়া সযত্নে রঙকরা ফিটফাট দেওয়ালের গায়ে দুটো বড় বড় চকচকে জলের কলসীর মাঝখানে পেরেকটি পোতা। হাজি মুরাদ পিস্তলটা পিঠের উপর ঠিকঠাক করে নেয়, তারপর কুশনের কাছে এগিয়ে আসে এবং সিরকাজীয় কুর্তাটা গায়ের সঙ্গে আঁটসাঁট ভাবে জড়িয়ে বসে পড়ে। খালি পায়ে তার পাশে বসে বৃদ্ধ চোখ বুজে দুই হাত উপরে তোলে। হাজি মুরাদও তাই করে। তারপর বয়েত পাঠ করে উভয়েই দুই গালে হাত দিয়ে এমনভাবে হাত নামায় যে দাড়ির শেষ প্রান্তে উভয়েই যুক্তকর হয়।

নে খবর? (নতুন খবর আছে?) বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে হাজি মুরাদ।

খবর অক্! (নতুন কিছুই নেই)। হাজি মুরাদের দিকে না চেয়ে স্তিমিত লাল চোখে নিজের বুকের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ জবাব দেয়।—আমি মৌমাছি পোযার চালায় থাকি, আজকেই এসেছি ছেলের সঙ্গে দেখা করতে···সে জানে।

হাজি মুরাদ চট করে ব্যাপারটা ধরে ফেলে। বুঝতে পারে, বৃদ্ধ যা জানে, কিম্বা হাজি মুরাদ যা জানতে চাইছে তা খুলে বলবার ইচ্ছা বুড়োর নেই। সে ঈষৎ মাথা নাড়ে, কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করে না। বৃদ্ধ বলে, তেমন ভাল খবর কিছু

নেই। খবরের মধ্যে খরগোসরা সলাপরামর্শ করছে, কেমন করে ঈগল তাড়াবে ; আর ঈগলরা এক একটা করে আলাদা ভাবে তাদের ছিঁড়ে খাচ্ছে। সেদিন রুশ কুত্তারা মিচিত আউলের খড় পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ ঘড়ঘড়ে গলায় বৃদ্ধ বলে ওঠে, ব্যাটাদের মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেললে সায়েস্তা হয়!

হাজি মুরাদের মুরিদ এই সময় ঘরে ঢোকে। মাটির মেজেয় সন্তর্পণে বলিষ্ঠ পা ফেলে লোকটি। শুধু ছোরাখানা এবং পিস্তলটা কাছে রেখে হাজি মুরাদের মতই সে বোরকা, রাইফেল এবং তরোয়াল খুলে ফেলে এবং যে পেরেকে প্রভুর হাতিয়ার ঝুলান রয়েছে সেইখানেই রেখে দেয়।

এ কে? আঙুল দিয়ে নবাগতকে দেখিয়ে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে।

আমার মুরিদ—নাম এলদার। হাজি মুরাদ বলে।

তা ভাল! বৃদ্ধ তখন এলদারকে হাজি মুরাদের পাশের এক আসনে বসবার ইঙ্গিত করে। পায়ের পর পা তুলে এলদার বসে পড়ে এবং ভেড়ার মত নিরীহ সুন্দর চোখে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে বৃদ্ধের দিকে। বৃদ্ধ তখন গল্প বলছে, কি করে তাদের বাহাদুর লোকজন দুটি রুশ সৈন্য পাকড়াও করে একজনকে খুন করছে, আর একজনকে ভেদেনে পাঠিয়ে দিয়েছে শামিলের কাছে।

হাজি মুরাদ অন্যমনস্কভাবে তার কথা শোনে এবং বাইরে শব্দ শুনে দরজার দিকে তাকায়। বাইরের ঘরে তখন পায়ের

শব্দ শোনা যায়, কপাটে কচমচ শব্দ হয় এবং গৃহকর্তা সাদো ঘরে ঢোকে। বছর চল্লিশেক বয়স লোকটির। বেশ তীক্ষ্ণ নাক—চোখও বেশ কালো। তবে পনেরো বছরের যে ছেলেটি তাকে ডাকতে গিয়েছিল, তার মত অত উজ্জ্বল নয়। বাবার সঙ্গে ছেলেটিও ঘরে ঢোকে এবং চৌকাঠের উপর বসে পড়ে। গৃহকর্তা সামনেই খড়ম খুলে রাখে এবং অতি জীর্ণ টুপিটা মাথার পেছনে ঠেলে দিয়ে চটপট এসে হাজি মুরাদের সামনে উবু হয়ে বসে। অনেকদিন কামান হয়নি বলে মাথায় কাল চুল গজিয়েছে।

বৃদ্ধের মত সেও হাত তুলে বয়েত পাঠ করে এবং গালে দাড়িতে হাত ঠেকিয়ে জোড়হাত করে। এর পর সে কথা বলতে আরম্ভ করে। বলে, হাজি মুরাদকে জীবিত কি মৃত অবস্থায় গ্রেপ্তার করার জন্য শামিল হুকুম দিয়েছেন....কালই চলে গেছে তাঁর লোকজন....গাঁয়ের লোক শামিলের হুকুম অমান্য করতে ভরসা পাচ্ছে না....কাজেই বিশেষ হুঁশিয়ার থাকা প্রয়োজন।

সাদো বলে, আমার জান থাকতে আমার বাড়ীতে আমার কুনাকের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না; কিন্তু বাইরে কি হবে? ....ভাল করে ভেবে দেখা দরকার।

হাজি মুরাদ নিবিষ্টমনে শোনে এবং মাথা নেড়ে সায় দেয়। কথা শেষ হ'লে বলে, আচ্ছা, তাহলে রুশদের কাছে একখানা চিঠি পাঠান দরকার। আমার মুরিদই যাবে, কিন্তু পথ দেখাবার একটা লোক দরকার যে!

আমার ভাই বাটা যাবে! সাদো বলে। তারপর ছেলের দিকে ফিরে বলে, যা, বাটাকে ডেকে নিয়ে আয়।

তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে ছেলেটি এবং হাত দুলিয়ে চটপট সাকলা থেকে বেরিয়ে যায়। মিনিট দশেক পরেই শিরাল পা খাটো এক চিচেনকে সঙ্গে করে ফিরে আসে। রোদে পুড়ে লোকটি প্রায় কালো হয়ে গেছে। গায়ে জীর্ণ শতছিন্ন হলদে একটা সিরকাজীয় কুর্তা। ঘষায় ঘষায় হাতা খুয়ে গেছে। হাঁটু অবধি কালো চামড়ার চাকনিও কোঁচকান।

নবাগতকে সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে কালক্ষেপ না করেই হাজি মুরাদ সরাসরি জিজ্ঞাসা করে, রুশদের কাছে আমার মুরিদকে নিয়ে যেতে পারবে না?

আলবাত পারব। বাটা বলে।—আর কোন চিচেন আমার মত ফাঁক কাটিয়ে যেতে পারবে না। অনেকে হয়ত রাজী হবে—বড়াইও করবে, কিন্তু কোন কাজ হবে না! আমি নিশ্চয় পারব।

হাজি মুরাদ বলে, বেশ, এ মেহেনতের জন্য তুমি তিন পাবে! তিনটি আঙুল দেখায় সে।

বাটা ঘাড় নেড়ে জানায় যে সে বুঝতে পেরেছে। বলে, অর্থে কিছুই এসে যায় না—ইজ্জতের জন্যই সে হাজি মুরাদের কাজ করবে। এ পাহাড়ের সবাই হাজি মুরাদকে চেনে—জানে কেমন করে সে রুশদের খতম করেছে।

ভাল কথা...দড়ি লম্বা হওয়া দরকার কিন্তু কথার সংক্ষেপই ভাল। হাজি মুরাদ বলে।

বেশ তাহলে চুপ করলাম। বাটা বলে।

হাজি মুরাদ তখন বলে, আরগুন নদী পাহাড়ের কাছে যেখানে বাঁক ঘুরেছে সেখানে বনের মধ্যে এক উপত্যকায় ছুটো পাঁজা আছে—চেনো ?

চিনি।

আমার চারজন ঘোড়সওয়ার সেখানে অপেক্ষা করছে। হাজি মুরাদ বলে।

ওঃ! মাথা নেড়ে বলে বাটা।

খান মহমার খোঁজ করবে। কি করতে হবে, কি বলতে হবে তার জানা আছে। তাকে রুশ সেনাপতি প্রিন্স ভরন্ত সভের কাছে নিয়ে যেতে পারবে না ?

খুব পারব।

নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে তো ?

নিশ্চয় !

তাহলে নিয়ে যাও; আবার ঐ বনেই ফিরিয়ে আনবে। আমি থাকব সেখানে।

সবই পারব। উঠে দাঁড়িয়ে বুকে হাত দিয়ে বাটা বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

হাজি মুরাদ তখন গৃহকর্তার দিকে ফেরে। বলে, চেখিতেও একটা লোক পাঠান দরকার। সিরকাজীয় কুর্তার একটা কার্তুজের থলিতে হাত দিয়ে সে কার্তুজ তুলতে যায়; কিন্তু সাকলায় ছুটি স্ত্রীলোক ঢুকতে দেখে হাত তুলে নেয় এবং কথা বন্ধ করে।

একজন ফিনফিনে মাঝারি বয়সের। সাদোর স্ত্রী। সে-ই কুশন পেতে দিয়ে গেছে। অপরটি কাল পাজামা আর সবজে বেশমত পরা এক তরুণী। মেয়েটির বুক ভরতি রৌপ্যমুদ্রার মালা; আর খাটো মোটা শক্ত কালো চুলের বেণীর নীচে কণ্ঠায় ঝুলছে একটি রূপোর রুবল মুদ্রা। বাপ-ভাইয়ের মত মেয়েটিরও কালো চোখ। দৃষ্টি খানিকটা কঠোর করবার চেষ্টা করলেও কচি মুখে কালো চোখদুটো ঝিকমিক করছে। অতিথিদের দিকে সে তাকায়নি; তবু তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে বেশ সচেতন।

সাদোর স্ত্রী একখানা নীচু গোল টিপয়ে সাজিয়ে চা, মাখন-মাখা প্যানকেক, পনীর, চুরেক (পাতলা গোল রুটি) এবং মধু নিয়ে আসে। মেয়েটির হাতে জলের পাত্র, জগ এবং তোয়ালে।

সাদো এবং হাজি মুরাদ চুপ করে বসে থাকে। মুদ্রার গহনা ঠুনঠান করে। লাল নরম সোলের চটি পায়ে আস্তে চলাফেরা করে মেয়েরা যা যা নিয়ে এসেছিল, অতিথিদের সামনে সাজিয়ে দেয়। যতক্ষণ মেয়েরা সাকলায় ছিল, চোখ নীচু করে নিজের পায়ের দিকে চেয়ে প্রস্তর মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে বসে থাকে এলদার। তারা চলে গেলে দরজার ওধারেও যখন তাদের মৃদু পদশব্দ মিলিয়ে যায়, তখনই সে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে।

হাজি মুরাদ তখন তার সিরকাজীয় কুর্তার কার্তুজের থলি থেকে একটা কার্তুজ এবং একখানা ভাঁজ-করা চিঠি বার করে বাড়িয়ে ধরে বলে, আমার ছেলেকে দিতে হবে।

জবাব কোথায় পাঠাতে হবে?

আপনার কাছে ; আপনি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

তা পারব। সাদো বলে। চিঠিখানা ও কার্তুজটি নিয়ে সে নিজের কোটের কার্তুজের পকেটে রাখে। তখন ধাতুর জগটা নিয়ে জলপাত্রটি সে অতিথির দিকে বাড়িয়ে ধরে।

হাজি মুরাদ তখন বেশমতের আস্তিন গুটিয়ে সাদা পেশল হাত বাড়িয়ে দেয়। পরিস্কার ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয় সাদো। পরিচ্ছন্ন মাড়-না-দেওয়া তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে সে টেবিলের দিকে ঘোরে। এলদারও তাই করে। অতিথিরা খাবার সময় সাদো তাদের মুখোমুখি বসে থাকে এবং বারকয়েক তাদের আসার জন্য ধন্যবাদ দেয়। ছেলেটি চৌকাঠের পাশেই বসে আছে, একবারও সে হাজি মুরাদের দিকে থেকে উজ্জ্বল চোখ ফেরায়নি। বাবার কথায় সায় দিয়েই যেন হাসছে।

চব্বিশ ঘণ্টা মুখে কিছু না পড়লেও হাজি মুরাদ সামান্য এক টুকরো রুটি এবং কিছু পনীর খায়। তারপর ছোরার নীচু থেকে ছোট্ট একটা ছুরি বার করে এক টুকরো রুটিতে মধু ছড়িয়ে দেয়।

হাজি মুরাদ মধু খাচ্ছে দেখে খুশি হয়ে বৃদ্ধ বলে, আমাদের মধুটা ভাল। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ সালের মধুটা যেমন ভাল, তেমন হয়েছেও অঢেল।

ধন্যবাদ! হাজি মুরাদ বলে এবং টেবিল থেকে মুখ ঘোরায়। এলদারের আরও খাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেও সর্দারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। টেবিল থেকে মুখ ঘুরিয়ে জগ ও জলপাত্রটি তার হাতে দেয়।

সাদো জানে, এ রকম অতিথিকে আশ্রয় দেওয়ার অর্থ নিজের জীবন বিপন্ন করা। শামিলের সঙ্গে ঝগড়ার পর তিনি ফতোয়া জারি করেছেন যে, চেচনিয়ার কোন লোক যদি হাজি মুরাদকে আশ্রয় দেয়, তার প্রাণদণ্ড হবে। এও সে জানে যে, তার ঘরে হাজি মুরাদের উপস্থিতির কথা টের পেলে আউলের লোক জড়ো হয়ে হয়ত তার আত্মসমর্পণ দাবী করবে। সাদো এতে ভড়কায়নি, বরং খুশিই হয়েছে। কারণ জীবনের বিনিময়েও অতিথিকে রক্ষা করা সে কর্তব্য বলে মনে করে। নিজের কর্তব্য করছে বলে সাদো গর্বিত ও আত্মসন্তুষ্ট।

আবার সে হাজি মুরাদকে বলে, যতক্ষণ আমার ঘরে আছেন আর আমার গর্দানে শির আছে, ততক্ষণ কেউ আপনার অনিষ্ট করতে পারবে না।

হাজি মুরাদ তার সুদীপ্ত চোখের দিকে তাকায় এবং তার আন্তরিকতা উপলব্ধি করে গম্ভীরভাবে বলে, প্রার্থনা করি দীর্ঘজীবী হয়ে সুখেশান্তিতে থাকুন।

আশীর্বাদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নীরবে বুকে হাত ঠেকায় সাদো।

সাকলার ঝিলমিলি আটকে দিয়ে এবং আগুনের চুলোয় খান কয়েক কাঠ দিয়ে অত্যন্ত খোশমেজাজে উচ্ছসিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে হারেমে যায় সাদো। এই অংশেই পরিবারের লোকজন থাকে মেয়েরা তখনও ঘুমোয়নি। অতিথিশালায় আজ বিপজ্জনক, অতিথিরা রাত্রিবাস করবে, তাদের সম্পর্কেই আলোচনা করছে।

হাজি মুরাদ যে আউলে রাত কাটাচ্ছে, ভোজদভিজেনস্কের সম্মুখের কেল্লা তা থেকে মাইল দশেক। তিনটি সৈনিক এবং একজন নন কমিশনড্ অফিসার কেল্লা থেকে বেরিয়ে শাহ-গিরিনস্কের ফটক পার হয়ে যায়। সেকালের ককেসীয় সৈনিকদের মত এদের বেশবাস। গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট, মাথায় টুপি। পায়ের বুট হাঁটু উপরে ওঠে। নিজের নিজের ক্লোক আঁটসাট ভাঁজ করে কাঁধে বেঁধে হাতিয়ার নিয়ে রাস্তা বরাবর প্রথমে তারা শ পাঁচেক পা এগোয়। তারপর মোড় ঘুরে ডাইনে কুড়ি পা যায়। বুটের চাপে শুকনো ঝরা পাতা খচমচ করে ওঠে। তবু তারা অন্ধকারে অস্পষ্টদৃশ্য একটা ভাঙা সরল গাছের গুঁড়ির কাছে যায়। এইখানেই থেমে দাঁড়ায়। এই সরল গাছের নীচেই পাহারাদার দল সাধারণতঃ গোপনে ওত পেতে থাকে।

বনপথে হাঁটবার সময় মনে হয়েছে উজ্জ্বল তারাগুলো বুঝি গাছের মাথায় ছুটে চলেছে। এইবার তারা থেমে দাঁড়ায়; গাছের নেড়া ডালের ফাঁকে ফাঁকে ঝিকমিক করে স্থিরভাবে।

শুকনো আছে তবু ভাল! নন-কমিশনড্ অফিসার পানভ বলে। ক্লাঙ্ শব্দ করে সে কাঁধ থেকে কিরীচ লাগান লম্বা বন্দুকটা নামায় এবং গাছে হেলান দিয়ে রাখে। সৈনিক তিনটিও অফিসারের অনুসরণ করে।

সহসা পানভ বেজারভাবে বলে ওঠে, নিশ্চয়ই হারিয়েছি! রেখে এলাম না পথে ফেলে দিয়েছি?

কি খুঁজছ? হাসিখুশি গলায় সৈনিকদের একজন জিজ্ঞাসা করে।

আমার পাইপের বাটি। গেলই বা কোন চুলোয়!

নলটা আছে? হাসিখুশি কণ্ঠস্বর আবার প্রশ্ন করে।

এই তো রয়েছে!

তাহলে সরাসরি মাটিতে লাগিয়ে নাও না কেন?

অত ঝামেলা কে করে?

দাঁড়াও, চটপট করে দিচ্ছি!

গোপন পাহারাদারিতে এসে ধূমপান নিষিদ্ধ। কিন্তু এ নামকোয়াস্তে পাহারাদারি। আদতে এটা ঘাঁটির মত। পাহাড়েরা অলক্ষ্যে কামান নিয়ে এসে যাতে কেল্লার উপর তোপ দাগতে না পারে, তার দিকে নজর রাখাই এখানকার একমাত্র কাজ। শুধু এজন্য তামাক টানার আরাম ছেড়ে দিতে পানভ রাজী নয়। কাজেই উৎফুল্ল সৈনিকটির প্রস্তাবে সে রাজী হয়। পকেট থেকে ছুরি বার করে সৈনিকটি মাটিতে একটা গোল ছোট্ট গর্ত করে। গর্তটি মসৃণ করে সে তার সঙ্গে নলটি খাটিয়ে দেয় এবং তারপর গর্তের মধ্যে ঠেসে তামাক ভরে। গন্ধকের একটি কাঠি জ্বলে ওঠে এবং পলকের জন্য উপুড়-হয়ে-শোওয়া সৈনিকটির প্রশস্ত মুখ উদ্ভাসিত করে। নলের মুখে বাতাস শিশ্ দেয়—পোড়া তামাকের আমেজী গন্ধ আসে পানভের নাকে।

ঠিক করে দিয়েছ? উঠে দাঁড়িয়ে সে বলে।

তবে!

কি ওস্তাদ ছেলে তুমি আভদীপ! বিচারকের মত জ্ঞানী! এইবার তাহলে আমাকে দাও একবার!

আভদীপ মোড় ফিরে ঘুরে যায় এবং মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। পানভ উপুড় হয়ে নলের মুখটা আস্তিনে মুছে টানতে শুরু করে।

তামাক টানতে টানতে সৈনিকেরা গল্প জুড়ে দেয়।

লোকে বলে, কমাণ্ডার নাকি আবারও ক্যাস-বাক্স হাতড়েছেন।

ছাড়া ছাড়া ভাবে একজন বলে ওঠে, জান না, আবার হেরেছে জুয়োয়!

তাহলেও আবার দিয়ে দেবে। পানভ বলে।

দেবে তো বটেই! চমৎকার অফিসার! আভদীপ সায় দেয়।

যে-সৈনিকটি আলোচনা শুরু করেছে আবারও সে বলে ওঠে, চমংকার! খুব চমৎকার! আমার মতে তাঁর সঙ্গে কোম্পানীর কথা বলা দরকার। জিজ্ঞাসা করা উচিত, যদি টাকা নিয়ে থাকেন তো কত নিয়েছেন আর দেবেনই বা কবে।

তা কোম্পানী যা ঠিক করে তাই হবে। পাইপ থেকে মুখ সরিয়ে পানভ বলে।

নিশ্চয়! জনতার একতার জোর ঢের বেশী! প্রবাদ বচন উদ্ধৃত করে আভদীপ সায় দেয়।

বসন্ত কালে জই বুট কিনতে হবে। তখন অর্থের দরকার! উনি যদি পকেটে ভরে থাকেন তো তখন কি হবে? অসন্তুষ্ট সৈনিকটি আবারও বলে।

বল্লাম তো কোম্পানী যা ভাল মনে করে তাই করা হবে! আবার বলে পানভ।—এ তো আর নতুন কিছু হয়নি! উনি তো অমন নিচ্ছেনও, আবার দিচ্ছেনও।

ককেসাস অঞ্চলে এ সময় রসদখানা তদারকির লোকজন সৈন্যেরা নিজেরাই বেছে ঠিক করত। প্রতিটি কোম্পানীর আলাদা ব্যবস্থা। সরকারী ট্রেজারি থেকে তারা সৈন্যপিছু প্রতিমাসে সাড়ে ছয় রুবল পেত। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হত। নিজেরা কপির চাষ করত, খড় বানাত, নিজের নিজের গাড়ি ছিল এবং সযত্নে পালিত ঘোড়ার জন্য তারা গর্ব করত। কোম্পানীর টাকা একটা সিন্দুকে রাখা হত। তার চাবি থাকত কমাণ্ডারের কাছে। প্রয়োজনে হামেশাই তাঁরা এ তহবিল থেকে টাকা ধার নিতেন। আবারও তাই ঘটেছে। তাই নিয়েই আলোচনা করছে সৈনিকেরা। মনমরা সৈনিক নিকিতিন কমাণ্ডারের কাছে হিসাব চাইবার পক্ষপাতী; কিন্তু পানভ এবং আভদীপ তার দরকার হবে বলে মনে করে না।

পানভের পর নিকিতিন তামাক খায়। তারপর ক্লোক বিছিয়ে সে সরল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে। সৈনিকেরা সবাই চুপচাপ। তাদের অনেক উঁচুতে আচমকা

হাওয়ায় সহসা গাছের মাথা নড়ে ওঠে। এই মৃদু খসখসানির মধ্যে সহসা শেয়ালের গোঙানি কঁকানি কান্না এবং চক্চক্ শব্দ শোনা যায়।

নচ্ছার জানোয়ারগুলোর ডাক শোন! বেড়ালের মত হাউ-মাউ করছে কেমন শোন।

একদিকে মুখ ফিরিয়ে আছ বলে তোমাদের উপহাস করছে। তৃতীয় অফিসার চড়া গলায় বলে ওঠে। লোকটি উক্রাইনস্কি।

আবার সবাই চুপ করে। বাতাসই কেবল গাছের ডালে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। একবার আড়াল করছে তারাগুলো, আবার উদ্ভাসিত করছে।

হাসিখুশ আভদীপ সহসা বলে ওঠে, আচ্ছা পানভ, কোন সময় তোমার মনমরা লাগে?

মনমরা, কেন? অনিচ্ছায় জবাব দেয় পানভ।

আমার লাগে কিনা, তাই! মাঝে মাঝে এমন বিচ্ছিরি লাগে যে নিজের উপর কি তখন করতে না পারি ভেবে পাই না।

বটে! তাই নাকি! জবাবে পানভ শুধু এই কথাটুকুই বলে।

সেবার বিচ্ছিরি লাগছিল বলেই তো সব টাকা মদ খেয়ে উড়িয়ে দিলাম। আমায় যেন পেয়ে বসল…এমনভাবে পেয়ে বসল যে, শেষে ভাবলাম, মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকব।

কখন কখন মদ খেলে আরও খারাপ হয়।

হাঁ, তাও হয়েছে। কিন্তু নিজেকে নিয়ে লোকে কি করবে বলতে পার ?

কেন তোমার এমন বিচ্ছিরি লাগে ?

কি বললে ? কেন লাগে ? কেন, বাড়ীর কথা ভেবে ভেবে !

তোমাদের বাড়ীর অবস্থা বুঝি খুব সম্পন্ন ?

না তো, সম্পন্ন আমরা নই। একসময় অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে পড়েছিল। তবে আমরা ভালভাবে থাকবার চেষ্টা করি। এর পর আভদীপ যে-গল্প শোনায়, অনেকবার সে-কথা শুনেছে পানভ।

শোন বলছি। ভাইএর বদলে ইচ্ছে করেই আমি সৈন্যদলে যোগ দি। তার ছেলেপিলে আছে। পরিবারে পাঁচজন লোক। আমার সবে বিয়ে হয়েছিল। মা আমাকেই যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন ভাবলাম, হয়ত আমার কথা মনে রাখবে। তাই মালিকের কাছে চলে গেলাম। মালিক লোক ভাল। বল্লে, চমৎকার ছেলে তুমি—চলে যাও। তাই দাদার বদলে চলে এলাম !

বেশতো ভালই করেছ। পানভ বলে।

তাহলেও বিশ্বাস কর পানভ, আজকে সেইজন্যই আরও বিচ্ছিরি লাগে। মনে মনে ভাবি, দাদার বদলে এলাম কেন ? বাড়ীতে সে রাজার হালে আছে আর এখানে আমি দুর্ভোগ ভুগছি। যতই একথা ভাবি, ততই আরও মন খারাপ হয়.... গোটা জিনিসটা দুর্ভাগ্য বলে মনে হয়।

আভদীপ চুপ করে যায়। একটু বাদে আবার বলে ওঠে, আর একবার তামাক খেলে কেমন হয় ?

বেশ তো—সাজো !

কিন্তু তামাক খাবার সময় পাওয়া গেল না। আভদীপ নলটা ঠিক করতে না করতেই পাহাড়ের উঁচুতে গাছের খস খসানির মধ্যে রাস্তার উপর পায়ের শব্দ শোনা যায়। পানভ অমনিই বন্দুক তুলে নেয় এবং পা দিয়ে নিকিতিনকে ঠেলা মারে।

নিকিতিনও উঠে ক্লোকটা তুলে নেয়। তৃতীয় সৈনিক বনদারেঙ্কোও উঠে দাঁড়িয়ে বলে, এমন একটা স্বপ্ন দেখছিলাম সাথী……

শশ্ ! আভদীপ সতর্ক করে দেয়। রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে থাকে সৈনিকেরা। নরম জুতো-পরা মানুষের পদধ্বনি ক্রমেই এগিয়ে আসে।

অস্পষ্ট অন্ধকারে ঝরাপাতা আর শুকনো লতার খচমচানি ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। তারপর কানে আসে চিচেন কণ্ঠের অদ্ভুত কণ্ঠ্যধ্বনি।

সৈনিকেরা এখন শুধু আগন্তুকের শব্দই টের পাচ্ছে না। স্পষ্ট দেখল, গাছের ফাঁকে এক ফালি খোলা জায়গা দিয়ে ছুটো ছায়া চলে যাচ্ছে।

একটি ছায়া অপরটি থেকে লম্বা। ছায়া ছুটি যখন তাদের সমান লাইনে আসে, বন্দুক হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে

পানভ। সাথারা তার অনুগমন করে। কে যায়? হাঁক দেয় পানভ।

আমি। দোস্ত চিচেন! বেঁটে লোকটি বলে। এ-ই বাটা। —বন্দুক অক (নেই)।···তরোয়াল অক! প্রিন্স, চাই।

লম্বা লোকটি সঙ্গীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। সেও নিরস্ত্র।

বলতে চাইছে ও স্কাউট, কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে চায়! সাথীদের বুঝিয়ে বলে পানভ।

প্রিন্স ভরনত্‌সভ···জরুরী দরকার। বড় কাজ! আবার বলে বাটা।

ঠিক আছে! ঠিক আছে! আমরা নিয়ে যাব'খন···। পানভ বলে; তারপর আভদীপের দিকে ঘুরে বলে, তুমি আর বনদারেঙ্কো নিয়ে যাও এদের। যে অফিসার এখন অফিসে কাজ করছে, তার হেফাজতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। মনে থাকে যেন! হাঁ, হুঁশিয়ার হয়ে সব সময় ওদের পেছন পেছন চলবে।

এটা আছে কি করতে? খোঁচা মারার ভঙ্গীতে সঙিন লাগান বন্দুকটা দেখিয়ে আভদীপ বলে।—এমন এক খোঁচা মারব যে ফুস করে পেটের সব হাওয়া বেরিয়ে যাবে।

তুমি খোঁচা মারলে ওদের থাকবে কি? বনদারেঙ্কো টিপ্পনী কাটে। নাও চল!

স্কাউট ও সৈনিকটির পায়ের শব্দ যখন আর শোনা যায় না, পানভ আর নিকিতিন তখন ঘাঁটিতে ফিরে আসে।

এমন অসময়ে হঠাৎ এল কি ভেবে? নিকিতিন জিজ্ঞাসা করে।

পানভ বলে, মনে হয় খুব দরকার পড়েছে। আঃ, বেশ ঠাণ্ডা লাগছে তো! ক্লোকটার ভাঁজ খুলে সে গায়ে জড়িয়ে গাছের পাশে বসে পড়ে।

আভদীপ ও বনদারেঙ্কো ফেরে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে।

কি, হাতে হাতে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছ?

হাঁ। কর্নেলের বাড়ীর কেউ এখনও ঘুমোয়নি। ওরা যেতেই সরাসরি তার কাছে নিয়ে গেল। জান সাথী, মাথা কামান ছেলেদুটি ভারি ভাল মানুষ! আভদীপ বলে যায়। সত্যি! আমার সঙ্গে কত কথাই যে হল!

আর সে গল্প তুমি বলবেও! বিরক্তভাবে নিকিতিন বলে।

সত্যি বলছি, ওরা ঠিক রুশদের মত! একজনের বিয়ে হয়েছে। আমি বল্লাম, মলি বার (আছে)? সে বলে, বার। বনদারেঙ্কো, আমি বার বলিনি? অনেক বার (আছে)? সে বলে, এক জোড়া! এক জোড়া, বুঝলে? এই সব ভাল ভাল কথা হল! চমৎকার লোক!

ভোর হয়ে এলো-এলো মনে হচ্ছে! আরাম করে বসে আভদীপ বলে।

সৈনিকরা আবার চুপ করে।

কেল্লার মধ্যে সৈনিকদের ব্যারাকের আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে; কিন্তু ভাল ঘরের জানালায় এখনও আলো দেখা যায়।

প্রিন্স সিমন মিহাইলোভিচ ভরন্তসভ এই সেরা বাড়ীতে থাকেন। ভরন্তসভ কুরিন রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার, সম্রাটের পার্শ্বচর এবং প্রধান সেনাপতির পুত্র। ভরন্তসভের স্ত্রী, পেতরবুর্গের বিখ্যাত রূপসী মারিয়া ভাসিলেভনা সঙ্গেই আছেন। এখানে এই ছোট্ট ককেশীয় কেল্লায় যত লোক বসবাস করে গেছে, তাদের সবাইর চাইতে জাঁকজমকে বাস করছেন ভরন্তসভ দম্পতি। ভরন্তসভের, তার চাইতেও বেশী তার স্ত্রীর মনে হত যে, এখানে তারা শুধু সাধারণ ভাবেই জীবনযাপন করছেন না— দুঃখ-কষ্টও পাচ্ছেন। কিন্তু স্থানীয় লোকের কাছে তাদের বিলাস-ব্যসন বিস্ময়কর এবং অত্যধিক বলে মনে হত।

গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রী এখন অতিথিদের সঙ্গে তাস খেলছেন। তাসের টেবিলে চারখানি মোম জ্বালান। ঘরটি বেশ প্রশস্ত। মেজেয় কার্পেট পাতা—জানালায় দামী পর্দা ঝুলান। ভরন্তসভের মুখ লম্বাটে, পোশাকে সম্রাটের পার্শ্বচরের পরিচয়-চিহ্ন স্বর্ণরজ্জু এবং এপলেট। তাসখেলায় তার জুটি বিষন্নমুখ উসকোখুসকো এক যুবক—পেতরবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য প্রিন্সেস ভরন্তসভা তাকে আনাবার ব্যবস্থা করেছেন। ছেলেটি তার প্রথম বিবাহের সন্তান। এদের বিরুদ্ধ জুটিতে আছে দুটি অফিসার। একজন বেশ প্রশস্তবক্ষ লাল মুখো কোম্পানী কমাণ্ডার, পলতোরাতস্কি। গার্ডদল থেকে তাকে বদলী করে আনা হয়েছে। অপরজন রেজিমেণ্টের এডজুটাণ্ট। বেশ সুদর্শন মুখ। গম্ভীরভাবে টান হয়ে বসে আছে লোকটি।

মেদবহুল প্রিন্সেস মারিয়া ভাসিলেভনার চোখ আয়ত, ভ্রূযুগল কালো। বেশ রূপসী। তিনি বসে আছেন পলতোরাতস্কির পেছনে। পাশ থেকে তাস দেখছেন। তার পুরু ঘাঘরা পায়ে ঠেকেছে। তার কথায় চাহনিতে হাসিতে গন্ধে—এক কথায় তার প্রতিটি ভঙ্গিমায় এমন কিছু ছিল যা পলতোরাতস্কিকে তার সান্নিধ্যের কথা ছাড়া আর সব কিছু ভুলিয়ে দিচ্ছে। ফলে সে ভুলের পর ভুল করছে আর তার জুটির মেজাজ ক্রমেই বিগড়ে যাচ্ছে।

নাঃ, একি! আবার একটা টেক্কা নষ্ট করলেন! পলতোরাতস্কি আবার একটা টেক্কা ফেলতেই চোখমুখ লাল করে রেজিমেণ্টের এডজুটাণ্ট বলে ওঠে।

প্রসন্ন কালো চোখ তুলে এমন গোবেচারি ভাবে পলতোরাতস্কি অসন্তুষ্ট এডজুটাণ্টের মুখের দিকে তাকায় যেন সদ্য সে ঘুম থেকে উঠেছে।

এবারের মত ওকে মাফ করুন! হেসে মারিয়া ভাসিলেভনা বলে।—কেমন, দেখলেন তো? আমি বলেছিলাম না? পলতোরাতস্কির দিকে ফিরে তিনি বলেন।

আপনি যা বল্লেন তার সঙ্গে কোন মিল নেই! হেসে পলতোরাতস্কি জবাব দেয়।

নেই নাকি? ঠোঁটে চটুল হাসি-রেখা টেনে তিনি প্রতি-জিজ্ঞাসা করেন। এই হাসি পলতোরাতস্কিকে এতটা উত্তেজিত এবং উৎফুল্ল করে যে, মুখচোখ লাল করে সে আবার তাস ভাঁজতে শুরু করে।

তাই দেখে এডজুটাণ্ট রুক্ষ মেজাজে বলে, বাঁট আপনার নয়। সাদা আংটি পরা হাতে সে এমন ভাবে ভাঁজতে শুরু করে যেন চটপট তাস বেঁটে দিতে পারেলেই বাঁচে।

প্রিন্সের খানসামা এই সময় ড্রয়িংরুমে ঢুকে জানায় যে কর্তব্যরত অফিসার প্রিন্সের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

প্রিন্স অমনিই উঠে দাঁড়িয়ে ইংরেজী উচ্চারণ ভঙ্গীতে রুশভাষায় বলেন, মাফ করবেন ভদ্রমহোদয়গণ! মারিয়া, আমার জায়গায় বস না!

কি, আপনারা রাজী তো? চটপট উঠে দাঁড়ান গৃহকর্ত্রী। তার রেশমী পোশাক খস্‌খস্‌ করে ওঠে—মুখে পরিতৃপ্তির প্রসন্নহাসি।

আমি সব কিছুতেই রাজী। প্রিন্সেস খেলতে জানেন না। কাজেই তিনি বিপক্ষে খেলতে যাচ্ছেন বলে খুশি হয়েই এডজুটাণ্ট বলে।

পলতোরাতস্কি শুধু হাত প্রসারিত করে হাসে।

প্রিন্স যখন বেশ চাঙ্গা এবং হাসি খুশি হয়ে ফের ড্রয়িংরুমে ঢোকেন, 'রাবার' তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

আমি কি প্রস্তাব করছি জান?

কি?

এখন খানিকটা শাম্পেন হলেই ভাল হয়।

আমি তার জন্য সব সময়েই প্রস্তুত। পলতোরাতস্কি বলে।

আপত্তি কি? এ তো ভাল কথা! এডজুটাণ্ট বলে।

নিয়ে এস ভাসিলি! প্রিন্স হুকুম করেন।

তোমার কাছে এসেছিল কেন? মারিয়া ভাসিলেভনা জিজ্ঞাসা করেন।

কর্ত্তব্যরত অফিসার এবং আর একজন লোক এসেছিল।

কেন? কিসের জন্য? মারিয়া ভাসিলেভনা অমনিই জিজ্ঞাসা করেন।

তা বলা উচিত হবে না। ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে ভরন্তসভ বলেন।

বলবে না তো? বেশ, দেখা যাবে। মারিয়া ভাসিলেভনা কৃত্রিম অভিমানভরে বলেন।

শ্যাম্পেন এলে সবাই এক এক গ্লাস খায়। তারপর খেলা শেষ করে হারজিতের হিসাব চুকিয়ে অতিথিরা চলে যায়।

কালকে আপনার কোম্পানীর জঙ্গলে যাবার হুকুম হয়েছে? পলতোরাতস্কি বিদায় নেবার সময় প্রিন্স জিজ্ঞাসা করেন।

হাঁ, আমার কোম্পানীই যাচ্ছে। কেন বলুন তো!

ঠিক আছে, কালকেই দেখা হবে। মৃদু হেসে প্রিন্স বলেন।

খুশি হলাম। ভরন্তসভ কি বলতে চাইছেন বুঝতে না পেরে পলতোরাতস্কি বলে। তখন সে মারিয়া ভাসিলেভনার সঙ্গে করমর্দনের আনন্দে অনন্যমনা।

অভ্যাসবশে মারিয়া ভাসিলেভনা শুধু তার হাতে চাপই দিলেন না, বেশ কয়েকটা ঝাঁকানিও দিলেন। তারপর রুহিতন

খেলার ভুলের কথা স্মরণ করিয়ে এমন ভাবে হাসলেন যাকে পলতোরাতস্কি আনন্দদায়ক প্রীতিভরা অর্থপূর্ণ হাসি বলেই গ্রহণ করল।

পলতোরাতস্কি সবিশেষ উৎফুল্ল হয়েই বাসায় ফেরে। অভিজাত সমাজের পরিবেশে মানুষ হয়ে এবং শিক্ষালাভ করে, বহুদিনের বিচ্ছিন্ন সামরিক জীবনের পর সমশ্রেণীর কোন মহিলার সঙ্গে যদি দেখা হয়, বিশেষ করে সে যদি মারিয়া ভাসিলেভনার মত মেয়ে হয়, তাহলে মনে যে কি ভাব জাগে তা শুধু পলতোরাতস্কি সম-পরিবেশের লোকেরাই উপলব্ধি করতে পারে।

ছোট একখানি বাড়ীতে সে আর তার সাথী থাকে। সদর দরজায় এসে সে কপাটে ঠেলা মারে। দরজা বন্ধ। বার কয়েক ধাক্কা মারে পলতোরাতস্কি। কোন সাড়া নেই। বেজায় বিরক্ত হয়। তখন তরোয়াল দিয়ে কপাটে ঢং ঢং শব্দ করতে থাকে। এই সময় দরজার ওপাশে পায়ের শব্দ শোনা যায়। তার চাকরান ভাভিলো এসে খিল খুলে দেয়।

দরজায় খিল দিয়েছিস কেন বুদ্ধু ?

কি করে সম্ভব হয় স্যর........

আবার নেশা করেছিস ? কি করে সম্ভব হয় দেখাচ্ছি। ভাভিলোকে মারতে গিয়ে পলতোরাতস্কি থেমে যায়।—জাহান্নামে যা......শিগগির মোম জ্বালা !

এখুনি জ্বালাচ্ছি স্যর!

সত্যিই নেশার আমেজ হয়েছে ভাভিলোর। অর্ডন্যান্স-সার্জেন্ট ইভান পেত্রোভিচের নামকরণের দিনের পার্টিতে সে মদ খেয়েছে। বাড়ী ফিরে ইভানের জীবনের সঙ্গে সে নিজের জীবনের তুলনা করে। ইভান মাইনে পায়, বিয়ে করেছে এবং বছরের মধ্যেই ছাড়া পাবে।

ভাভিলোকে নিয়ে আসা হয়েছে নাবালক অবস্থায়। তার মানে, নাবালক বয়সে তাকে মালিকের সংসারে চাকরানের কাজে নিয়ে আসা হয়েছে। বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও আজও তার বিয়ে হয়নি। খাম-খেয়ালি তরুণ মালিকের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মরছে। মালিক লোক ভাল। মারধর বড় করে না। তবু এ কেমনধারা জীবন? ভাভিলো ভাবে, ককেশাস থেকে ফিরে গিয়ে আমায় ছেড়ে দেবে বলেছে। কিন্তু কোথায় যাব স্বাধীনতা পেয়ে? না, এ জীবন কুত্তার চেয়েও অধম! তার এত ঘুম পায় যে পাছে চোর ঢুকে সব নিয়ে যায় এই ভয়ে দরজার খিল আটকে ঘুমিয়ে পড়ে।

পলতোরাতস্কি শোবার ঘরে ঢোকে। তিখনভ এঘরে তার সঙ্গী।

ঘুম থেকে উঠে তিখনভ বলে, কি হে, হারলে নাকি?

নাঃ! যেমন হয় তাই হয়েছে! জিতেছি। সতেরো রুবল। এক বোতল ক্লিকতও খাওয়া হয়।

মারিয়া ভাসিলেভনার দিকেও চেয়েছিলে তো?

হাঁ, চেয়েছি মারিয়া ভাসিলেভনার দিকে। পুনরুক্তি করে পলতোরাতস্কি। তিখনভ তখন বলে, সকাল সকাল উঠতে হবে কিন্তু। ছ'টার সময় রওনা হবার কথা।

ভাভিলো! পলতোরাতস্কি হাঁক দেয়।—পাঁচটার সময় ঠিকমত ডেকে দিবি।

আপনি লড়াই করলে ডেকে দিব কেমন?

বলছি আমার ঘুম ভাঙাবি। খেয়াল থাকবে?

থাকবে। পলতোরাতস্কির বুট ও জামা-কাপড় নিয়ে ভাভিলো বেরিয়ে যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে পলতোরাতস্কি সিগ্রেট ধরায়। তারপর মোম নিভিয়ে মুচকি হাসে। অন্ধকারেও মারিয়া ভাসিলেভনার হাস্যোজ্জ্বল মুখ তার চোখের সামনে ভাসছে।

ভরন্তসভ দম্পতি অমনিই শুতে গেল না। অভ্যাগতেরা চলে যাবার পর মারিয়া ভাসিলেভনা স্বামীর কাছে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কড়া মেজাজে জিজ্ঞাসা করেন, হাঁ, এখন বল ব্যাপার কি আমায় বলবে কিনা?

স্বামী স্ত্রীর আলোচনা ফরাসীতেই হয়।

কিন্তু, মাই ডিয়ার······

মাই ডিয়ার বলে ভুলাতে এস না। দূত এসেছিল, তাই না?

ধরো যদি এসেই থাকে, তাহলেও তোমাকে বলা উচিত হবে না।

বলবে না তো ? বেশ তাহলে আমিই বলছি।

তুমি ?

হাজি মুরাদ এসেছিল, তাই না ? মারিয়া ভাসিলেভনা বলে। দিন কয়েক আগে থাকতেই তার কানে এসেছে যে আলাপ আলাচনা চলছে। তাই ভেবেছে, হাজি মুরাদ নিজেই তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ভরন্তসভ পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারল না। বললে, হাজি মুরাদ নিজে আসেনি, এসেছিল তার দূত। সে এসে বলে গেল যে কাঠ কাটার অভিযানে যেখানে যাওয়া হচ্ছে, কালকে সেইখানেই হাজি মুরাদ তার সঙ্গে দেখা করবে। স্বামীর কথা শুনে খানিকটা হতাশ হয় মারিয়া।

কেল্লার একঘেয়ে জীবনের মধ্যে এই ঘটনায় তরুণ ভরন্তসভ দম্পতি খুশিই হয়। দুটো তখন বেজে গেছে। বাবা এই সংবাদ পেলে কত খুশি হবেন তাই নিয়ে খানিকটা আলোচনা করে তারা শুতে যায়।

পর পর তিনরাত ঘুম হয়নি হাজি মুরাদের। তাকে ধরবার জন্য শামিল মুরিদ পাঠিয়েছেন। তাদের হাত এড়াবার জন্য তিনটি বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে। কাজেই সাদো বিদায় নিয়ে সাকলা থেকে বেরিয়ে যাবার পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। হাতে মাথা রেখে সাজপোশাক পরেই সে ঘুমোয়। গৃহকর্তার লাল নরম কুশনে কনুই ডেবে যায়।

এলদার ঘুমোচ্ছে খানিকটা দূরে—দেয়ালের পাশে। চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে সে। যৌবনদীপ্ত বলিষ্ঠ অঙ্গ-প্রতঙ্গ এমন ভাবে টান করে দিয়েছে যে সাদা সিরকাজীয় কুর্তার বুকের উপর বসানো কার্তুজের থলেটা সদ্য-কামান নীলচে চকচকে মাথা থেকে খানিকটা উঁচু হয়ে পড়েছে। মাথা পড়ে গেছে বালিশ থেকে—খানিকটা চিতিয়ে আছে। ছোট ছোট গোঁফ-গজান ওষ্ঠ শিশুর মত খানিকটা হাঁ-করে আছে। একবার বুজছে, আবার হাঁ করছে। মনে হয় যেন চুষছে কিছু। হাজি মুরাদের মত সেও কোমরে পিস্তল ও ছোরা নিয়ে শুয়েছে। চুল্লীর লকড়িগুলো নিভু নিভু হয়ে এসেছে—কুলুঙ্গির প্রদীপও স্তিমিত।

মাঝ রাতে অতিথিশালার মেজেয় পায়ের শব্দ শোনা যায়। পিস্তলে হাত দিয়ে হাজি মুরাদ অমনিই উঠে পড়ে। সাদো পা টিপে টিপে ঘরে ঢোকে।

কি ব্যাপার? হাজি মুরাদ জিজ্ঞাসা করে। মনে হয় সে একদম ঘুমোয়নি।

ব্যাপারটা ভেবে দেখা দরকার। তার সামনে বসে সাদো বলে।—ঘরের চাল থেকে একটি স্ত্রীলোক আপনাকে আসতে দেখেছে। সে তার স্বামীকে বলে দেয়। এতক্ষণে গোটা আউলে জানাজানি হয়ে গেছে। এক পড়শী এসে আমার স্ত্রীকে বলে গেল যে, প্রবীনেরা মসজিদে জমায়েত হয়েছেন এবং আপনাকে আটক করতে চান।

এখুনি আমায় চলে যেতে হবে। হাজি মুরাদ বলে।

ঘোড়ায় জিন লাগান আছে। সাদো বলে এবং চটপট সাকলা থেকে বেরিয়ে যায়।

হাজি মুরাদ চাপাগলায় ডাকে, এলদার! নিজের নাম, তার উপর প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনে এলদার তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে। উঠবার মুখে সে টুপি ঠিক করে নেয়।

হাজি মুরাদ প্রথমে অস্ত্রশস্ত্র পরে নেয়, তারপর বোরকা জড়ায়। এলদারও তাই করে। তারপর উভয়েই নিঃশব্দে সাকলা থেকে বেরিয়ে বৈঠকখানায় ঢোকে। কালো চোখ ছেলেটি ঘোড়া এনে দেয়। শক্ত রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে পাশের সাকলার কে একজন যেন দরজা ফাঁক করে তাকায়। তার পরেই খড়ম খট খট করে লোকটি পাহাড়ের উপর মসজিদের দিকে দৌড়ে যায়। চাঁদ নেই, তবু অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রগুলো এমন উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে যে সাকলা গুলোর চালের অস্পষ্ট কালো রেখা দেখা যায়। গাঁয়ের উপরের দিকে মসজিদের মিনারের কালো ছবিও আর সব বাড়ীর উপরে মালুম হয়। মসজিদ থেকে একটা গুঞ্জনও কানে আসছে।

চটপট বন্দুকটা ধরে হাজি মুরাদ সরু রেকাবে পা দেয় এবং নিঃশব্দে অনায়াসে এক ঝঁকানি দিয়ে উঁচু গদি-আঁটা জিনের উপর উঠে বসে। ডানপায়ে রেকাব ছুঁয়ে গৃহস্বামীকে লক্ষ্য করে সে বলে, আল্লা আপনার মঙ্গল করুন। তার পরে চাবুকটা আস্তে ঘোড়া-ধরা ছেলেটির গায়ে ঠেকিয়ে

তাকে ছেড়ে দেবার ইঙ্গিত করে। ছেলেটি সরে দাঁড়ায়। অমনিই ঘোড়াটি যেন সব কিছু জানে এই ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে প্রধান সড়কের দিকে এগোয়। এলদার পেছনেই আছে। ভেড়ার চামড়া মুড়ি দিয়ে সাদোও পাশাপাশি দৌড়োতে থাকে। হাত দুলিয়ে ছুটছে আর একবার গলিটির এদিকে যাচ্ছে, আবার পার হয়ে ওদিকে যাচ্ছে। রাস্তার মোড়ে প্রথমে একটি চলন্ত ছায়া পড়ে, তারপর আরেকটি ছায়াও দেখা দেয়।

থাম! কে যায়? থাম! একজন হেঁকে বলে। জনকয়েক লোক রাস্তা আটকে দাঁড়ায়।

না থেমে হাজি মুরাদ কোমর থেকে পিস্তল টেনে বার করে এবং জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে পথ প্রতিরোধীদের দিকে এগিয়ে যায়। তারা ভাগ হয়ে যায়। পেছন ফিরে না দেখেই দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় হাজি মুরাদ। এলদারও জোর কদমে তার অনুগমন করে। সহসা তাদের পেছনে দুটো গুলির আওয়াজ হয়। দুটি বুলেট সাঁ করে পাশ দিয়ে উড়ে যায়। হাজি মুরাদ বা এলদার কারও গায়ে লাগে না। হাজি মুরাদ ঠিক একই ভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে। শ'তিনেক গজ এগিয়ে সে ঈষৎ-হাঁপান ঘোড়াটা থামিয়ে কান পেতে শোনে।

সামনে অনেক নীচে কল কল খল খল শব্দে জলস্রোত ছুটছে। পেছনে মোরগ ডাকছে আউলের মধ্যে। একটার

ডাক শুনে ডেকে উঠছে আর একটা। এইসব শব্দের মধ্যে সে পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ এবং জনকয়েক লোকের আওয়াজ শুনতে পায়। হাজি মুরাদ ঘোড়াটাকে চলবার ইঙ্গিত করে আস্তে আস্তে এগোয়। পেছনের লোকজন জোর কদমে ছুটে এসে তাদের ধরে ফেলে। এই আউলেরই জন বিশেক অশ্বারোহী আসছে হাজি মুরাদকে আটক করবার আশায়। অন্ততঃ শামিলের কাছে জবাবদিহি করবার জন্য ধরবার একটা ভাব্ তারা দেখাতে চায়। অন্ধকারেও দেখা যায় এতটা কাছাকাছি যখন তারা আসে, হাজি মুরাদ থামে, বলগা ছেড়ে দেয় এবং বাঁ হাতের অভ্যস্ত ভঙ্গীতে রাই-ফেলের ঢাকনি খুলে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়ে রাইফেলটা টেনে বার করে। এলদারও তাই করে। হাজি মুরাদ হেঁকে বলে, কি চাও তোমরা? আমাকে গ্রেফতার করতে চাও? বেশ, কর তাহলে! এই বলেই রাইফেলটা সে উঁচিয়ে ধরে। আউলের লোকজন থেমে দাঁড়ায়। রাইফেল হাতে নিয়ে হাজি মুরাদ হুড় হুড় করে দরির মধ্যে নেবে যায়। ঘোড়সওয়াররা তার অনুসরণ করে, কিন্তু খুব কাছে এগোতে ভরসা পায়নি। হাজি মুরাদ যখন দরির ওপারে যায়, এদিক থেকে এরা তারস্বরে বলে যে এদের বক্তব্য তার শুনে যাওয়া উচিত। জবাবে হাজি মুরাদ রাইফেলের গুলি করে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। আবার যখন সে ঘোড়া থামায়, অনুসারীদের আওয়াজ তখন আর শোনা যায় না।

মোরগের ডাকও কানে আসছে না আর। তখন শুধু জঙ্গলের ঝরণার কুল কুল শব্দই স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে প্যাঁচা ডেকে উঠছে দু'একটা। জঙ্গলের কালো প্রাচীর খুব কাছাকাছিই মনে হয়। এই জঙ্গলেই অপেক্ষা করছে তার মুরিদরা।

এখানে এসে হাজি মুরাদ থামে এবং টেনে শ্বাস নেয়। তারপর শিশ্ দিয়ে নীরবে কানপেতে অপেক্ষা করে। মিনিট খানেক পরেই ঠিক তেমনি আর একটা শিশ্ জঙ্গল থেকে তার জবাব দেয়। রাস্তা ছেড়ে হাজি মুরাদ তখন জঙ্গলে ঢোকে। শ'খানেক পা এগিয়েই গাছের গুঁড়ির ফাঁকে একটা আগুন দেখতে পায়। পাশে-বসা গুটিকয়েক মানুষের ছায়া মূর্তি এবং আগুনের আধ-আলোয় জিন লাগান একটা ঘোড়াও মালুম হয়। চারজন লোক বসে আছে আগুনের পাশে।

একজন চটপট উঠে হাজি মুরাদের কাছে এসে তার বল্গা ও রেকাবে হাত দেয়। লোকটি হাজি মুরাদের পাতান ভাই। সে-ই দেখা শোনা করত তার গৃহস্থালীর কাজকর্ম।

ঘোড়া থেকে নেমে হাজি মুরাদ বলে, আগুন নিভিয়ে ফেল।

অনুচরেরা কাঠগুলো ছড়িয়ে দিয়ে জ্বলন্ত ডালপালার উপর পা দিয়ে মাড়ায়।

মাটিতে ছড়ান একটা বোরকার দিকে এগিয়ে হাজি মুরাদ জিজ্ঞাসা করে, বাটা এখানে এসেছিল ?

হাঁ। খান মহমাকে নিয়ে তো সে অনেকক্ষণ চলে গেছে !

কোন পথে গেছে ?

ঐ পথে। যে পথ দিয়ে হাজি মুরাদ এসেছে, আঙুলের ইশারায় তার বিপরীত দিক দেখিয়ে খানেফি বলে।

ঠিক আছে! হাজি মুরাদ বলে এবং রাইফেলটা খুলে টোটা ভরে।—খুব হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে। আমার পেছু নিয়েছিল। যে লোকটি আগুন নেভাচ্ছে তাকে লক্ষ্য করে সে বলে।

এর নাম গামজালো—জাতে চিচেন। গামজালো অমনিই বোরকার কাছে গিয়ে রাইফেলটা তুলে খাপের মধ্যে ভরে এবং কোন কথা না বলে হাজি মুরাদ উপত্যকার যে দিক দিয়ে এসেছে, সেই দিকে চলে যায়।

এলদার ঘোড়া থেকে নেমে হাজি মুরাদের ঘোড়াটা ধরে এবং তারটা আর হাজি মুরাদেরটাকে জিন লাগান অবস্থায় মুখ উঁচু করে তুটো গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে। তারপর রাইফেলটা কাঁধে ফেলে সেও গামজালোর বিপরীত দিকে যায়। আগুন নিভে গেছে, তবু জঙ্গলটা তখন আর তত অন্ধকার নয়। আকাশে তখনও নক্ষত্র আছে। মিটি মিটি জ্বলছে।

সপ্তর্ষি-মণ্ডল মধ্যাকাশে এসেছে দেখে হাজি মুরাদ বুঝতে পারে যে তুপুর রাত আগেই পেরিয়ে গেছে। রাত্রির নমাজের সময়ও অতিক্রান্ত। খানেফির কাছে সে একটা জগ চায়। তাদের পুঁটুলিতে সব সময় থাকত। তারপর বোরকা পরে সে জল আনতে যায়।

জুতো খুলে হাত মুখ ধুয়ে খালি পায়েই বোরকার পর হাঁটু ভেঙে সে নমাজ পড়তে বসে। প্রথমে ছুইকানে আঙুল ঠেকিয়ে চোখ বুজে সে দক্ষিণ মুখে ফেরে; তারপর যথারীতি নমাজ পড়ে।

নমাজ পড়া শেষ করে সে পোঁটলা-পুঁটলির কাছে ফিরে আসে এবং বোরকার পর বসে হাঁটুর উপর কনুই রাখে; তারপর মাথা হেঁট করে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়।

নিজের ভাগ্যের উপর অগাধ বিশ্বাস হাজি মুরাদের। কোন কিছু পরিকল্পনা করবার সময় আগাম সে সাফল্য সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় হয়ে পড়ে। ভাবে, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। তার ঝটিকাসংকুল সামরিক জীবনের ইতিহাসে কচিৎ ব্যতিক্রম ছাড়া ঘটেছেও তাই। কাজেই সে ভাবছে যে এবারও তাই হবে। কল্পনায় সে ছবি আঁকে যে ভরন্তসভের দেওয়া বাহিনী নিয়ে সে সামিলের বিরুদ্ধে অভিযান করবে, তাকে বন্দী করবে এবং শোধ তুলবে তার উপর। রুশ জারও তাকে পুরস্কার দেবে এবং আবার সে শুধু আভেরিয়ার উপরেই নায়েবি করবে না, গোটা চেচনিয়াও তার অধীনতা স্বীকার করবে। এই কথা ভাবতে ভাবতেই সে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখে, গান গাইতে গাইতে কেমন করে সাহসী অনুচর সহ 'হাজি মুরাদ আসছে' এই ধ্বনি তুলে সে শামিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে…তাকে এবং তার জানানাদের বন্দী করছে। জানানাদের চীৎকার ও ডুকরে কান্নাও যেন সে

শুনতে পায়। সহসা তার ঘুম ভেঙে যায়। লায়া-ইল-আলিশা গান, হাজি মুরাদ আসছে ধ্বনি এবং শামিলের জানানাদের কান্নার বদলে তার কানে আসে শেয়ালের হুক্কা-হুয়া, খ্যাক খ্যাকানি এবং কঁকিয়ে ডাকা। এই চেঁচামেচিতেই তার ঘুম ভাঙে। মাথা তুলে সে আকাশের দিকে তাকায়। দুটো গাছের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে এক ফালি। পূব আকাশ ফর্শা হয়ে এসেছে। দূরে-বসা এক মুরিদকে সে খান মহমার খোঁজ জিজ্ঞাসা করে। খান মহমা আসেনি শুনে আবার সে মাথা নীচু করে এবং অমনিই ঘুমিয়ে পড়ে।

খান মহমার সোল্লাস ডাকে তার ঘুম ভাঙে। বাটাকে নিয়ে সে ফিরে এসেছে। খান মহমা তার পাশে বসে শোনায়ঃ কেমন করে সৈনিকদের সঙ্গে তার দেখা হয় এবং কেমন করেই বা তারা তাকে সরাসরি প্রিন্সের কাছে নিয়ে যায়। সে আরও বলে যে, প্রিন্স বেজায় খুশি হয়েছেন এবং মিচিতের ওধারে শালিন উপত্যকায় রুশরা যেখানে কাঠ কাটবে, আজ সকালে প্রিন্স সেখানে দেখা করবেন বলে কথা দিয়েছেন। বাটা তখন নিজের তরফ থেকে অভিযানের খুঁটিনাটি বিবরণ শোনায়।

রুশ পক্ষে যোগ দেবার জন্য হাজি মুরাদ যে প্রস্তাব করেছে তার জবাবে ভরন্তসভ ঠিক কি কথা বলেছেন বিশেষ করে সেইটেই জানতে চায় হাজি মুরাদ। খান মহমা এবং বাটা দুজনেই সমস্বরে জানায় যে, তিনি হাজি মুরাদকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ

করতে রাজী হয়েছেন এবং তার যাতে ভাল হয় সেই ভাবেই কাজ করতে স্বীকৃত হয়েছেন।

হাজি মুরাদ তখন পথের খবর জিজ্ঞাসা করে। খান মহমা যখন ভরসা দেয় যে পথ সে ভাল ভাবে চিনেছে এবং অনায়াসে যথাস্থানে নিয়ে যেতে পারবে, হাজি মুরাদ তখন প্রতিশ্রুত তিনটি রুবল বার করে বাটাকে দেয়। তারপর সে পোঁটলা থেকে তার সোনার কাজ করা অস্ত্রশস্ত্র এবং কুল্লা বার করে সাফ করবার হুকুম দেয়। রুশদের কাছে যাবার সময় যাতে ভাল দেখায় তার ব্যবস্থা করতে হবে তো!

অনুচরেরা তার অস্ত্রশস্ত্র, জিন, লাগাম এবং ঘোড়া সাফ সাফাই করতে করতে নক্ষত্র ডুবে যায়। পূব আকাশে আলোর খেলা শুরু হয়। হুহু করে বয়ে যায় ফুরফুরে প্রভাতী হাওয়া।

খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতেই পলতোরাতস্কির নেতৃত্বে কুড়োল নিয়ে দুটি কোম্পানী শাহগিরিনস্ক ফটকের ছয় মাইল দূরে যায় এবং একদল সৈন্যকে পাহারায় মোতায়েন করে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গাছ কাটতে শুরু করে। আটটা নাগাদ জ্বলন্ত ভেজা কাঁচা পাতার গন্ধমাখা ধোঁয়া কুয়াশার সঙ্গে মিশে যায়। হিস্‌হিস্ চটপট্ শব্দে পোড়ে কাঁচা পাতা। কাঠুরিয়ারা এতক্ষণ পাঁচ পা দূরের কিছুও দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু কানে শুনেছিল পরস্পরের কথা-বার্তা। এইবার তারা আগুন এবং কাটা গাছে আটকান বনপথ দুটোই দেখতে পায়। উজ্জ্বল

থালার মত সূর্যও দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ক্ষণেক দেখা যায় আবার লুকিয়ে যায়।

রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে একটা ঢালু জায়গায় পলতোরাতস্কি, তার অধীনস্থ অফিসার তিখনভ, তিন নম্বর কোম্পানীর দুটি অফিসার এবং ফ্রিজ নামে গার্ডদলের এক সাবেক অফিসার ভেরীর উপর বসে আছে। সামরিক কলেজে পলতোরাতস্কির সতীর্থ ছিল ফ্রিজ। ডুয়েল লড়ার জন্য পদাবনতি হয়েছে। তাদের সামনে খাবার মোড়া ছেঁড়া কাগজ, পোড়া সিগ্রেটের টুকরো এবং গুটি কয়েক শূন্য বোতল ছড়ান। অফিসাররা কিছু ভোদকা খেয়েছে—এখনও খাচ্ছে। পোর্টারও (মদ) চলছে সঙ্গে। ভেরী বাজিয়ে তৃতীয় বোতলটির ছিপি খুলছে।

গত রাত্রে পলতোরাতস্কির ভাল ঘুম হয়নি। তবু বিপদের সম্ভাবনার মুখে সৈনিক ও সহ-অফিসারদের সঙ্গে থাকলে স্বভাবত যে বেপরোয়া আনন্দ ও অদ্ভুত উত্তেজনা সে অনুভব করে, আজও তার অভাব নেই।

অফিসাররা আলোচনায় মত্ত। আলোচনার বিষয়বস্তু সর্বশেষ সংবাদ ঃ জেনারেল স্লেপত্সভের মৃত্যু। এই মৃত্যুকে, মানব জীবনের এই পরম মুহূর্তকে তারা একটি জীবনের ছেদ এবং উৎসমুখে প্রত্যাবর্তন বলে গ্রহণ করেনি। তারা এর মধ্যে দেখেছে এক সাহসী অফিসারের বীরত্ব। তরোয়াল হাতে নিয়ে যিনি পাহাড়েদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং খুন করেছেন বেপরোয়াভাবে।

এদের সকলেই জানে, বিশেষ করে লড়াইতে যাদের যোগ দিতে হয়েছে তাদের তো বাধ্য হয়েই জানতে হয়েছে যে, হাতাহাতি সংগ্রামের যে-কল্পনা ও বর্ণনা সাধারণত করা হয়, ককেসাস অঞ্চলে সেকালে তেমন খুনোখুনি হত না। বস্তুতঃ কোথাও কোন সময় হয় না। কালেভদ্রে কোন সময় যদি তরোয়াল সঙিন নিয়ে কাটাকাটি হয় তো যারা পালাবার চেষ্টা করে তারাই কাটা পড়ে। তবু হাতাহাতি সংগ্রামের এই কাল্পনিক কাহিনী এদের মনে একটা গোপন গর্ব এবং প্রফুল্লতা সৃষ্টি করে। কেউ কেউ বসে থাকে চালের মাথায়, আর বাকী সবাইর ভাব অতি-বিনয়ী। মৃত্যুর দুশ্চিন্তা না করে এরা মদ খায়, হাসি-ঠাট্টা করে। অথচ শ্লেপত্‌সভের যেমন ঘটেছে, তেমনি ভাবে যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু এসে এদের টুটি টিপে ধরতে পারে। এই আলোচনার মধ্যে ওদের ধারণা সত্য প্রতিপন্ন করবার জন্যই যেন পথের বাঁ দিকে সহসা রাইফেলের গুলির উত্তেজক শব্দ হয়। কুয়াশাভরা হাওয়ার মধ্য দিয়ে সাঁ করে উড়ে গিয়ে একটা গুলি দূরের একটা গাছে লাগে।

পলতোরাতস্কি অমনিই সোল্লাসে বলে ওঠে, হ্যালো, এযে আমাদের লাইন লক্ষ্য করেই! তারপর ফ্রিজের দিকে ফিরে বলে, এইবার কোস্ত্যা! এইবার তোমার পালা। কোম্পানীতে চলে যাও। গোটা কোম্পানী নিয়ে আমি বেষ্টনীর সাহায্য করব। এমন লড়াইর আয়োজন করব যে দেখবে কি মজা হয়! তারপর রিপোর্ট করা যাবে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রিজ গটমট করে কোম্পানীর দিকে চলে যায়। খানিকটা দূরে কুয়াশা-ঘেরা এক জায়গায় সে সৈন্যদলটি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে।

পলতোরাতস্কির হরেকরকম ডোরাকাটা পাটকেল-রঙা বাহন ছোট্ট কাবার্দাকে তার কাছে নিয়ে আসা হয়। ঘোড়ায় চড়ে সে সৈনিকদের সারবন্দী করে দাঁড় করায় এবং তারপর যে দিক থেকে গুলি এসেছে সেই দিকে রওনা হয়ে যায়। বনের কিনারে খাদের নেড়া ঢালুর সামনে ঘাঁটি বানান হয়েছে। বনের দিকে হাওয়া বইছে, কাজেই খাদের তলদেশ পর্যন্ত মালুম হয় না; তবে ওপারটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। পলতোরাতস্কি সৈন্যব্যূহের কাছে আসতে আসতেই কুয়াশার প্রাচীর ডিঙিয়ে সূর্য উপরে ওঠে। খাদের ওপারে নতুন একটা বনের কিনারে প্রায় পোয়া মাইল দূরে জন কয়েক ঘোড়সওয়ার দেখা যায়। হাজি মুরাদের অনুসরণকারী চিচেন এরা। রুশদের সঙ্গে তার মিলন দেখতে এসেছে। তাদের একজন রুশ সৈন্যের লাইন লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এদিক থেকে জনকয়েক জবাব দেয়। চিচেনরা পেছু ছুটে যায়। গুলি ছোঁড়াছুড়িও বন্ধ হয়।

কোম্পানীসহ এখানে পৌঁছে এ সত্ত্বেও পলতোরাতস্কি গুলি করার হুকুম দেয়। হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই গোটা লাইনের সৈনিকরা পটাপট গুলি করতে শুরু করে। বিলীনীয়মান ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করে নিরবচ্ছিন্ন গুলি ছুটতে থাকে। একটা কিছু করবার সুযোগ পেয়ে সৈনিকরা চটপট টোটা ভরে মনের

মুখে গুলির পরে গুলি চালাতে থাকে। রুশ সৈনিকের এই আকস্মিক উত্তেজনা চিচেনদেরও প্রভাবিত করে। একজনের পর আর একজন এগিয়ে এসে তারাও রুশ সৈনিকদের লক্ষ্য করে কয়েকটা করে গুল ছুঁড়ে যেতে থাকে। এই গুলির একটায় এ পক্ষের একটি সৈনিক আহত হয়। গত রাত্রে গোপন পাহরায় যে গিয়েছিল সেই আভদীপই আহত হল।

সঙ্গীরা যখন তার কাছে যায়, দুই হাতে পেট চেপে ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে আভদীপ তখন মোড়মুড়ি করছে আর চাপা গলায় কঁকাচ্ছে। পলতোরাতস্কির কোম্পানির লোক সে। সৈনিকদের জটলা দেখে পলতোরাতস্কির এগিয়ে আসে।

বলে, কি হয়েছে এখানে? গুলি লেগেছে? কোথায়?

আভদীপ জবাব করল না। তার পাশের সৈনিকটি বলে, স্যর, গুলি ভরবার সময় আমি একটা ক্লিক্ শব্দ শুনতে পাই। চেয়ে দেখি, ও হাতের বন্ধুক ফেলে দিয়েছে।

জিভ দিয়ে পলতোরাতস্কি টাট্ টাট্ শব্দ করে।—খুব লাগছে আভদীপ?

খুব লাগছে না, তবে হাঁটবার জো নেই। এখন এক ফোঁটা ভোদকা পেলে ভাল হয় স্যর।

খানিকটা ভোদকা এনে দেওয়া হয়। ককেসাস অঞ্চলে সাধারণ সৈনিকেরা যে মদ খেত, ভোদকার বদলে একে তাই বলাই উচিত। ভুরু কুঁচকে পানভ তাকে ক্যানের ঢাকনি-ভরা মদ এনে দেয়। আভদীপ খাবার চেষ্টা করে; কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়ে বলে, আমার মুখে রুচবে না, তুমিই খাও।

পানভ মদটুখু খেয়ে ফেলে।

আভদীপ উঠবার চেষ্টা করে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বসে পড়ে। তখন একটা ক্লোক ছড়িয়ে তাকে শুইয়ে দেওয়া হয়।

সার্জেন্ট-মেজর তখন পলতোরাতস্কিকে বলে, কর্নেল আসছেন স্যর ?

ঠিক আছে। তুমি তাহলে এর দেখাশোনা কর! এই বলেই চাবুকটা ঘুরাতে ঘুরাতে সে জোর কদমে ভরন্তসভের সঙ্গে দেখা করতে যায়।

ছিন্নমুস্ক পাটকেল-রঙা ইংরেজ ঘোড়ায় চড়ে এসেছে ভরন্তসভ। বাহনটির জন্ম-পরিচয়ের কৌলিন্যও সুপরিজ্ঞাত। ভরন্তসভের সঙ্গে আছে এক কজাক এডজুটাণ্ট এবং এক চিচেন দোভাষী।

কি হচ্ছে এখানে ? ভরন্তসভ জিজ্ঞাসা করে।

আজ্ঞে, একদল হানাদার আমাদের আগুয়ান সৈন্যদলকে আক্রমণ করেছিল। পলতোরাতস্কি জবাব দেয়।

চল—চল! সব কিছুই নিজে নিজে নিজে ঠিকঠাক করে ফেল্লে!

না না, আমি কিছুই করিনি প্রিন্স! হেসে বলে পলতোরাতস্কি। —ওরাই নিজের ইচ্ছায় এগিয়ে যায়।

শুনলাম একটি সৈনিক নাকি আহত হয়েছে ?

হাঁ, বড় দুঃখের কথা। ভাল সৈনিক ছেলেটি।

আঘাত গুরুতর ?

মনে হয় গুরুতর। পেটে লেগেছে!

বলতে পার কোথায় যাচ্ছি ? ভরন্তসভ জিজ্ঞাসা করে।

পারব না।

আন্দাজ করতে পার না ?

তাও পারব না।

হাজি মুরাদ আত্মসমর্পণ করছে ; তার সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।

বলেন কি ?

কাল তার দূত এসেছিল। অনেক কষ্টে আত্মসন্তুষ্টির হাসি চেপে বলে ভরন্তসভ।—মিনিট কয়েক পরেই শালিন উপত্যকায় সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। উপত্যকা অবধি বন্দুকধারীদের মোতায়েন করে দাও, তারপর আমার সঙ্গে এস।

বুঝেছি! টুপিতে হাত ঠেকিয়ে পলতোরাতস্কি বলে ; তারপর নিজের কোম্পানীর দিকে ফিরে যায়। ডান দিকে সে নিজেই সৈনিকদের মোতায়েন করে। বাঁ দিকে করবার হুকুম দেয় সার্জেন্ট-মেজরকে।

জন কয়েক সৈনিক ধরাধরি করে আভদীপকে ইতিমধ্যে কেল্লায় নিয়ে যায়।

ভরন্তসভের কাছে ফিরে আসবার পথে পলতোরাতস্কি লক্ষ্য করে যে জনকয়েক ঘোড়সওয়ার তাকে ধরে ফেলবার চেষ্টা

করছে। সন্মুখে সাদা কেশরওলা ঘোড়াটির সওয়ারের চেহারা বেশ আকর্ষনীয়। তার মাথায় পাগড়ি, কোমরে সোনার কাজ করা হাতিয়ার। এই লোকটাই হাজি মুরাদ। পলতোরাতস্কির কাছাকাছি এসে তাতার ভাষায় সে কি যেন বলে। ভুরু টান করে পলতোরাতস্কি অঙ্গভঙ্গী করে বুঝিয়ে দেয় যে সে বুঝতে পারেনি। তার হাসির প্রত্যুত্তরে হাজি মুরাদও হাসে। এই হাসির শিশুসুলভ সরলতা পলতোরাতস্কিকে মুগ্ধ করে। দুর্দান্ত পার্বত্য সর্দারের এমনভাব দেখবে বলে সে কল্পনাও করেনি। সে ভেবেছে, বিষন্ন কাটখোট্টা একটা লোকের দেখা পাবে। কিন্তু তার সামনের লোকটি এমন জীবন্ত, তার হাসি এমন সরলতামাখা যে তাকে পলতোরাতস্কির বহুদিনের পরিচিত বলেই মনে হয়। একটি বৈশিষ্ট্য লোকটির আছে ঃ তার চোখ দুটি দূরে সন্নিবিষ্ট। কিন্তু কালো ভুরুর তলায় সে চোখের চাহনি এমন শান্ত, এত একাগ্র, এমন তীক্ষ্ণ যে অন্যের চোখে যেন বিঁধে বসে।

হাজি মুরাদের দলে মাত্র পাঁচজন লোক। খান মহমাও আছে তার মধ্যে। গত রাত্রে সে ভরন্তসভের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। গোলাপের মত লাল টুকটুকে চেহারা খান মহমার। চাঁদপনা মুখ—ভুরু জোড়া কালো। সদা প্রফুল্ল আনন্দদীপ্ত হাবভাব লোকটির। আভর খানেফিও আছে এদলে। বেশ গোট্টাগোট্টা লোমশ চেহারা। ভুরু দুটি জোড়া। হাজি মুরাদের গোটা সম্পত্তির ভার তার উপর ন্যস্ত। বলিষ্ঠ

একটা ঘোড়ার জিনের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা পুঁটলির মধ্যে সে তাই বয়ে বেড়াচ্ছে। দলের দুটি লোকের চেহারা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার মধ্যে একজন জাতে লেশঘিয়ান— প্রশস্ত কাঁধ কিন্তু স্ত্রীলোকের মত সরু কটিদেশ। যুবকটির সুন্দর চোখ দুটি ভেড়ার মত নিরীহ, মুখে সদ্য গজান কটা দাঁড়ির রেখা। এর নাম এলদার। বাকী লোকটির নাম গামজালো। জাতে চিচেন। তার মুখে খাটো লাল দাড়ি। ভুরুও নেই। চোখের পাতা পক্ষ্মহীন। লোকটির একটা চোখ কানা। নাকে ও মুখে একটা কাটার দাগ। ভরন্তসভ এই সময় রাস্তার উপর আসে। পলতোরাতস্কি আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে দেয়। হাজি মুরাদ অমনিই ঘোড়া ছুটিয়ে তার দিকে এগোয় এবং ডান হাত বুকের পর রেখে তাতার ভাষায় কি একটা বলে থেমে দাঁড়ায়। চিচেন দোভাষী অনুবাদ করে শোনায়ঃ বলছে, আমি রুশ জারের কাছে আত্মসমর্পণ করছি। বলছে, আমি তার সেবা করতে চাই। অনেক আগে থেকেই সে ইচ্ছা আমার ছিল কিন্তু শামিল বাধা দিয়েছে।

দোভাষীর কথা শুনে ভরন্তসভ তার চামড়ার দস্তানাপরা হাতখানা হাজি মুরাদের দিকে বাড়িয়ে দেয়। পলকের জন্য হাজি মুরাদ হাতের দিকে চেয়ে ইতস্তত করে, তারপর দৃঢ়ভাবে হাত ধরে আবার কিছু বলে। প্রথমে সে দোভাষীর দিকে তাকায়, তারপর চায় ভরন্তসভের দিকে।

বলছে, আপনার কাছে ছাড়া অপর কোন লোকের কাছে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা তার ছিল না ; কারণ আপনি সর্দারের পুত্র। আপনাকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন।

ভরন্তসভ মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানায়। অনুচরদের দেখিয়ে হাজি মুরাদ আবারও কিছু বলে।

এই সব লোক তার অনুচর। তার মত এরাও রুশদের সেবা করবে।

ভরন্তসভ তখন তাদের দিকে ফেরে এবং মাথা নেড়ে তাদেরও সম্ভাষণ জানায়। হাসিখুশি কালচোখ পক্ষ্মহীন চিচেন খান মহমাও মাথা নেড়ে অভিবাদন করে এবং সম্ভবত হাসির কথা বলে। কারণ তার কথা শুনে হাসির আবেগে লোমশ আভরটির গজদন্তের মত সাদা দাঁতের পাটি বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু চোখ লাল কানা গামজালো শুধু পালকের জন্য ভরন্তসভের দিকে তাকায় ; তারপর আবার চেয়ে থাকে তার ঘোড়ার কানের দিকে।

ভরন্তসভ এবং সানুচর হাজি মুরাদ যখন কেল্লায় ফিরে আসে, সৈনিকদের তখন লাইন থেকে ছুটি দেওয়া হয়। জটলা করে তারা নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করে।

কত লোক যে হারামজাদা ব্যাটা শেষ করেছে! এখন দেখ ওকে নিয়ে কত ধুমধাম করা হবে!

খুবই স্বাভাবিক। লোকটা শামিলের ডান হাত ছিল। এখন আর ভয় কি ? তাহলেও একথা স্বীকার করতেই হবে

লোকটা চমৎকার……রীতিমত দজিগিত (১)! আর ঐ চোখ লাল লোকটা। কেমন জানোয়ারের মত চায় দেখেছ! ধ্যেৎ! ব্যাটা আস্ত কুত্তা!

সবাই চোখলাল লোকটাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছে। গাছ কাটার জায়গা থেকে রাস্তার কাছাকাছির লোকজন ছুটে দেখতে আসে। অফিসার তাদের ধমক দেয়, কিন্তু ভরন্তসভ তাকে থামতে বলে।

পুরনো দোস্তকে দেখে যাক না।

কে জান? কাছাকাছির সৈনিকটিকে ইংরেজী উচ্চারণ ভঙ্গীতে টেনে টেনে জিজ্ঞাসা করে ভরন্তসভ।

না, ইওর একসেলেনসি!

হাজি মুরাদ…নাম শুনেছ?

কেন শুনব না ইওর একসেলেনসি! সেনাপতির সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পেয়ে প্রসন্নভাবে বলে সৈনিকটি।

হাজি মুরাদ বুঝতে পারে যে তার সম্পর্কেই কথাবার্তা হচ্ছে। হাস্যোজ্জ্বল চোখে সে তাকায়।

উৎফুল্ল হয়েই কেল্লায় ফেরে ভরন্তসভ।

হাজি মুরাদকে দলে ভিড়াবার এবং তাকে অভ্যর্থনা করবার সুযোগ একমাত্র ভরন্তসভ ছাড়া আর কেউ পায়নি

(১) দজিগিত: সাহসী—কিন্তু এর সঙ্গে অশ্বারোহনের কৌশল অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত।

বলে সে বেজায় খুশি। হাজি মুরাদ যে সে লোক নয়—রাশিয়ার প্রধান সক্রিয় শত্রু শামিলের পরেই তার স্থান। কিন্তু একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে গেছে।

জেনারেল মেলার-জাকোমেলস্কি ভোজদভিজেনস্ক এলাকার সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি। গোটা ব্যাপার তার মারফতেই করা উচিত ছিল।

কোন সংবাদ না জানিয়ে ভরন্তসভ নিজে সব কিছু করছে বলে খানিকটা অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। এই খুঁতখুতানি তার আনন্দে খানিকটা ব্যাঘাত জন্মায়। বাসায় পৌঁছে হাজি মুরাদের অনুচরদের ভার সে রেজিমেণ্টের এডজুটাণ্টের উপর দেয়, আর হাজি মুরাদকে নিজেই অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে যায়।

চটকদার বেশ-ভূষায় সজ্জিতা হাস্যময়ী মারিয়া ভাসিলেভনা আর তার ছয় বছরের কোঁকড়ান চুল প্রিয়দর্শন ছেলেটি ড্রয়িং রুমে হাজি মুরাদের সঙ্গে দেখা করে। হাজিমুরাদ বুকে হাত দিয়ে দোভাষীর মারফত সসম্ভ্রমে জানায় যে প্রিন্স তাকে ঘরে এনেছেন বলে প্রিন্সকে সে কুনাক বলে গণ্য করে এবং কুনাকের গোটা পরিবার কুনাকের মতই পবিত্র।

হাজি মুরাদের চেহারা ও আচরণ মারিয়া ভাসিলেভনাকে প্রীত করে। তিনি তার মোটা হাতখানা বাড়িয়ে দিলে হাজি মুরাদের মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। তাই দেখে তিনি আরও খুশি হন। তিনি তাকে বসতে অভ্যর্থনা করেন এবং সে কফি খায় কিনা

জিজ্ঞাসা করে কিছু কফি আনাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কফি আসবার পর সে খেতে অস্বীকার করে। রুশভাষা খানিকটা খানিকটা বোঝে হাজি মুরাদ ; কিন্তু বলতে পারে না। বুঝতে পারল না এমন কিছু বলা হলে সে হাসে। পলতোরাতস্কির মত এ হাসি মারিয়া ভাসিলেভনারও ভাল লাগে। চুল কোঁকড়ান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাচ্চা ছেলেটি (মা তাকে ডাকেন বুলকা বলে) পলকের জন্যও হাজি মুরাদের দিক থেকে মুখ ফেরায়নি। এতকাল যত গল্প তাকে শোনান হয়েছে, তাতে হাজি মুরাদকে বিরাট যোদ্ধা বলেই বর্ণনা করা হয়েছে।

হাজি মুরাদকে স্ত্রীর সঙ্গে রেখে, তার পক্ষান্তর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট করবার জন্য ভরন্তসভ অফিসে চলে আসে। বামপার্শ্বের সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি জেনারেল কোজলভস্কির কাছে গ্রজনিতে রিপোর্ট লিখে এবং বাবার কাছে এক পত্র লিখে ভরন্তসভ চটপট বাড়ী ফিরে আসে। তার শঙ্কা হয় যে, এই মারাত্মক আগন্তুককে স্ত্রীর সঙ্গে একলা রেখে আসবার জন্য সে হয়ত বিরক্ত বোধ করবে। আগন্তুক ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন ব্যবহার করা উচিত হবে না বটে, তবু খুব সদয় ব্যবহার করাও অসমীচীন। কিন্তু তার দুশ্চিন্তা অহেতুক। ভরন্তসভের সৎ ছেলে বুলকাকে হাঁটুর উপর নিয়ে হাজি মুরাদ আর্ম চেয়ারে বসেছিল এবং মাথা নীচু করে মন দিয়ে শুনছিল দোভাষীর কথা। হাস্যময়ী মারিয়া ভাসিলেভনার কথা ভাষান্তর করছিল দোভাষী। মারিয়া ভাসিলেভনা বলছিলেন যে কুনাক কোন জিনিস প্রশংসা

করলেই যদি সেটা তাকে দিয়ে দিতে হয়, তাহলে অচিরেই তাকে আদমের মত সব কিছু ত্যাগ করতে হবে।

প্রিন্স ঘরে ঢুকতেই হাজি মুরাদ চট করে উঠে দাঁড়ায়। কোল থেকে নামিয়ে দেবার জন্য বুলকা অবাক হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাজি মুরাদের হাসিখুশি ভাব বদলে গিয়ে মুখে একটা কঠোর গম্ভীর ভাব ফুটে বেরোয়। ভরন্তসভ বসবার পরেই আবার সে বসে।

আগেকার আলোচনার খেই ধরে সে মারিয়া ভাসিলেভনাকে বলে যে, কুনাক যা প্রশংসা করবে তাকে সেটা উপহার দেওয়া তাদের জাতের রীতি।

আপনার ছেলে কুনাক। ছেলেটির কোঁকড়ান চুলে হাত বুলিয়ে রুশ ভাষায় বলে সে। বুলকা ইতিমধ্যে আবার তার কোলে উঠেছে।

আচ্ছা ছেলে তোমরে ঐ দস্যি! ফরাসীতে স্বামীকে বলেন মারিয়া ভাসিলেভনা।—বুলকা ওর ছোরার প্রশংসা করেছিল, তাই ওখানা দিয়ে দিয়েছে ওকে।

বাবাকে ছোরাখানা দেখায় বুলকা। ফরাসীতে মারিয়া বলেন, বেশ দামী জিনিস!

ভরন্তসভও ফরাসীতে জবাব দেন, সুযোগমত আমাদেরও ওকে একটা কিছু উপহার দিতে হবে।

মাথা হেঁট করে ছেলেটির কোঁকড়ান চুলে হাত বুলোতে বুলোতে হাজি মুরাদ বলে, দজিগিত! দজিগিত!

সুতীক্ষ্ণ ছোরাখানা আর্দ্ধেকটা খাপ থেকে বার করে ভরন্তসভ বলেন, ভারি চমৎকার ছোরা! ধন্যবাদ! তারপর দোভাষীর দিকে ফিরে বলেন, জিজ্ঞেস করতো ওর জন্য আমরা কি করতে পারি?

দোভাষী তর্জমা করে শোনায়। হাজি মুরাদ সঙ্গে সঙ্গে জানায় যে, কিছুই সে চায় না, শুধু নমাজ পড়তে পারে এমন একটা জায়গা পেলেই খুশি হবে।

তার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে একলা হবার সঙ্গে সঙ্গে হাজি মুরাদের মুখের ভাব বদলে যায়। তার প্রসন্ন সদয় রাশভারী মুখভঙ্গী উবে যায়। মুখে ফুটে বেরোয় দুশ্চিন্তার রেখা। যতটা আশা করেছে, তার চাইতে অনেক ভালভাবেই ভরন্তসভ তাকে অভ্যর্থনা করেছে। অভ্যর্থনা যতই ভাল হচ্ছে, ভরন্তসভ এবং তার অফিসারদের প্রতি হাজি মুরাদের অবিশ্বাসও ততই বাড়ছে। সব রকম চিন্তাই মনে জাগছে। ভাবছে, তাকে বন্দী করে শৃঙ্খলিত অবস্থায় সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠান হবে, নয়তো সরাসরি হত্যা করা হবে। কাজেই সে খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলছে! এলদার যখন তার ঘরে ঢোকে, তার কাছে সে মুরিদ-দের খোঁজখবর নেয়। জিজ্ঞাসা করে, কোথায় তাদের রেখেছে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিয়েছে কিনা……ঘোড়াই বা কোথায় আছে। এলদার জানায় যে ঘোড়া প্রিন্সের আস্তাবলে আছে, তাদের থাকতে দেওয়া হয়েছে একটা গোলাঘরে আর দোভাষী চা খাবার দিয়ে যাচ্ছে।

হাজি মুরাদ সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়ে। তারপর বেশবাস খুলে নমাজ পড়ে। এলদারকে তখন সে রূপোর ছোরাখানা নিয়ে আসতে বলে। তারপর আবার সে বেশভূষা পরে এবং বেল্টটা কোমরে আটকে দিয়ে ডিভানের পর পা ভেঙে বসে পড়ে। যা বরাতে থাকে হোক!

বিকেল চারটার সময় দোভাষী এসে তাকে প্রিন্সের সঙ্গে খেতে ডাকে।

পোলাউ ছাড়া আর কিছুই সে খেল না। তাছাড়া মারিয়া ভাসিলেভনা যে জায়গা থেকে পোলাউ তুলে নেন, সে-ও সেই জায়গা থেকেই পোলাউ তুলে খায়।

মারিয়া ভাসিলেভনা স্বামীকে বলে, আমরা ওকে বিষ খাওয়াব বলে শঙ্কা করছে। আমি যে জায়গা থেকে পোলাউ নিয়েছি, ও-ও ঠিক সেই জায়গা থেকে তুলে নিয়েছে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে হাজি মুরাদের দিকে ফিরে দোভাষীর মারফত জিজ্ঞাসা করে, কখন আবার সে প্রার্থনা করবে। সূর্যের দিকে ইশারা করে হাজি মুরাদ পাঁচটা আঙুল দেখায়। তাহলে তো আর বেশী দেরি নেই! ঘড়িটা বার করে ভরন্তসভ একটা চাবিতে চাপ দেয়। ঘড়িতে সওয়া চারটা বাজে। ব্যাপারটা হাজি মুরাদকে অবাক করে দেয়। আবার সে ঘড়ির বাজনা শুনতে চায়—দেখতে চায় ঘড়িটা।

মারিয়া তখন স্বামীকে ফরাসীতে বলে, এই সুযোগ! ঘড়িটা দিয়ে দাও!

সঙ্গে সঙ্গে ভরন্তসভ হাজি মুরাদকে ঘড়িটা দিতে চায়।

বুকের উপর করতল চেপে সে ঘড়িটি গ্রহণ করে। বার কয়েক সে চাবিটা চেপে ধরে কান পেতে শোনে ; তারপর আনন্দদীপ্ত প্রসন্নমুখে মাথা নাড়ে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মেলার জাকোমেলস্কির পার্শ্বচরের আগমন সংবাদ জানান হয়।

পার্শ্বচর জানায় যে, হাজি মুরাদের আগমন বার্তা শুনে তার কাছে রিপোর্ট না করার দরুণ জেনারেল বেজায় অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং অবিলম্বে হাজি মুরাদকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। ভরন্তসভ বলে যে, জেনারেলের আদেশ অবশ্যই প্রতিপালিত হবে। দোভাষীর মারফত হাজি মুরাদকে এই আদেশের কথা জানিয়ে তাকে তার সঙ্গে মেলারের কাছে যেতে বলে।

পার্শ্বচরের আসবার উদ্দেশ্য জানতে পেরে মারিয়া ভাসিলেভনা অমনিই বুঝতে পারে যে, জেনারেল ও তার স্বামীর মধ্যে এই ব্যাপার নিয়ে একটা অপ্রীতিকর অবস্থা দেখা দিতে পারে ; কাজেই স্বামীর শত নিষেধ সত্ত্বেও সে তাদের সঙ্গী হবার সঙ্কল্প করে।

তোমার বাড়ীতে থাকাই ভাল……এ আমার ব্যাপার, তোমার নয়!

আমি যাব জেনারেলের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে! তাতে তুমি বাধা দিতে পার না!

অন্য কোন সময় গেলেও তো পার!

না, আমি এখুনি যাব!

মারিয়াকে নাছোরবান্দা দেখে ভরন্তসভ শেষ অবধি রাজী হয়। তিনজনেই যায় একসঙ্গে।

তারা যখন পৌঁছায়, মেলার ক্ষুব্ধমুখে সৌজন্যসহকারে মারিয়া ভাসিলেভনাকে স্ত্রীর কাছে নিয়ে যায়, পার্শ্বচরকে আদেশ দেয় হাজি মুরাদকে দর্শনার্থীর ঘরে বসাতে এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাকে বাইরে না আসতে দিতে। 'আসুন' বলে তারপর সে পড়ার ঘরের দরজা ঠেলে ধরে এবং প্রিন্স ভরন্তসভকে আগে ঘরে ঢুকতে দেয়।

ঘরে ঢুকেই সে ভরন্তসভের মুখোমুখি দাঁড়ায় এবং তাকে বসবার আমন্ত্রণ না জানিয়ে বলে, এখানে আমি সেনাধ্যক্ষ, শত্রুর সঙ্গে সমস্ত আলাপ-আলোচনা আমার মারফতেই চালাতে হবে! কেন আমায় জানাননি যে হাজি মুরাদ আমাদের দিকে চলে এসেছে?

হঠাৎ এক দূত এসে তার আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জানায়। উত্তেজনায় বিবর্ণ হয়ে ভরন্তসভ বলে। আশা করে ক্রুদ্ধ জেনারেল আরও দু'চারটে কড়া কথা বলবেন। তার ক্রোধ ভরন্তসভের মধ্যেও সংক্রামিত হয়।

আমি শুধু জানতে চাইছি, কেন আমায় সংবাদ দেওয়া হয়নি।

আপনাকে সংবাদ জানাবার ইচ্ছা ছিল ব্যারন, কিন্তু......

আপনি আমায় ব্যারন বলে সম্বোধন করতে পারেন না। আপনাকে সম্বোধন করতে হবে 'ইওর একসেলেনসি' বলে!

এই সময় ব্যারনের রুদ্ধ ক্ষোভ ফেটে পড়ে এবং এতকাল তার অন্তরে যত কথা টগবগ করে ফুটছে, তাই বলে ফেলেন।

পারিবারিক সম্পর্কের দৌলতে সেদিন যারা সামরিক কাজে ঢুকেছে, আমার নাকের ডগায় তারা একতেয়ারের বাইরের জিনিস সম্পর্কে হুকুম চালাবে, তাই দেখবার জন্য সাতাশ বছর আমি রাজার সেবা করিনি।

ইওর একসেলেনসি! আমার অনুরোধ, আপনি অহেতুক অভিযোগ করবেন না! বাধা দিয়ে ভরন্তস্ভ বলে।

ঠিক কথাই বলেছি! এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না যে ......। আরও চটে জেনারেল কথাটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ হবার আগেই ঠিক সেই মুহূর্তে পোশাক খসখস করে মারিয়া ভাসিলেভনা ঘরে ঢোকে। পেছনে আটপৌরে চেহারার বেঁটে এক মহিলা—মেলার জাকোমেলস্কির স্ত্রী। মারিয়া ভাসিলেভনা অমনিই বলতে শুরু করে, শুনুন ব্যারন, শুনুন! সিমন আপনাকে অসন্তুষ্ট করতে চায়নি।

তার কথা বলছি না, প্রিন্সেস!

তা বেশ! আসুন সবাই সব কিছু ভুলে যাই! জানেন তো, ভাল ঝগড়ার চাইতে খারাপ শান্তিও ভাল! ওঃ ডিয়ার, কি যে বলছি! সঙ্গে সঙ্গে মারিয়া ভাসিলেভনার ঠোঁটে উচ্ছল হাসি ফুটে বেরোয়।

রূপসীর মোহিনী হাসিতে ক্রুদ্ধ জেনারেল অমনিই বশ হন। তার গোঁফের তলায় হাসি রেখা দেখা দেয়।

ভরন্তসভ বলে, স্বীকার করছি আমার ত্রুটি হয়েছে, কিন্তু……

আমিও একটু বেশী চটে গিয়াছিলাম! মেলার বলে এবং ভরন্তসভের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

আপস হয়ে গেল। স্থির হয়, হাজি মুরাদ আপাতত জেনারেলের কাছেই থাকবে এবং পরে তাকে বামপার্শ্বের কমাণ্ডারের হেফাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

হাজি মুরাদ পাশের ঘরেই বসেছিল। সব কথা না বুঝলেও যতটা তার বোঝা দরকার, তা সে বুঝেছে। বুঝেছে যে তাকে নিয়েই ঝগড়া হচ্ছে এবং তার শামিলের পক্ষত্যাগ রুশদের পক্ষে অসীম গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই তারা তাকে নির্বাসন বা মৃত্যুদণ্ড তো দেবেই না, বরং তাদের কাছ থেকে অনেক কিছুই সে আদায় করে নিতে পারবে। এও সে বুঝতে পারে যে, মেলার জাকোমেলস্কি সেনাধ্যক্ষ হলেও অধীনস্থ ভরন্তসভের মত প্রভাব-প্রতিপত্তি তার নেই। ভরন্তসভের গুরুত্ব আছে কিন্তু মেলার জাকোমেলস্কির নেই। সুতরাং মেলার জাকোমেলস্কি যখন তাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে, হাজি মুরাদ বেশ গর্বোন্নত চালে সসম্ভ্রমে জবাব দেয়। বলে, শ্বেত জারের সেবা করবার উদ্দেশ্যেই সে পর্বত ছেড়ে এসেছে; কাজেই একমাত্র তাঁর সর্দার, মানে প্রধান সেনাপতির কাছেই সে জবাব দিহি করবে। তার মানে সে এই ভরন্তসভের বাবা প্রিন্স ভরন্তসভের কাছে তিফলিসে জবাবদিহি করতে চায়।

আহত আভদীপকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কেল্লার সামনে বোর্ড দিয়ে চাল-ছাওয়া ছোট্ট একখানা কাঠের ঘরে হাসপাতাল। সাধারণ ওয়ার্ডের শূন্য এক বেডে তাকে রাখা হয়। আরও চারটি রোগী আছে এ ওয়ার্ডে। একজনের টাইফাস—বেদম জ্বর। আর একজন পালা জ্বরের রোগী। পাংশুটে চেহারা, চোখের নীচে কালো দাগ। আজ তার জ্বরের পালা ; বারে বারে হাই তুলছে। আর দুজন হপ্তাতিনেক আগে এক হানাদারি অভিযানে আহত হয়েছে। একজনের হাতে লেগেছে—সে উঠে চলা-ফেরা করতে পারে। আর একজনের আঘাত কাঁধে। সে বিছানায় বসে আছে। টাইফাস রোগীটি ছাড়া আর সবাই জটলা করে নবাগত এবং তাকে যারা নিয়ে এসেছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

বাহকদের একজন বলে, সময় সময় এমনভাবে গুলি করে যেন কড়াই ছুঁড়ছে বলে মনে হয়, কিন্তু আজকে মাত্র পাঁচটি গুলি করেছে।

যার যা বরাতে আছে !

বাহকেরা বিছানায় শুইয়ে দেবার সময় যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আভদীপ ওঃ ! আঃ ! করে ওঠে। কিন্তু বিছানায় শুইয়ে দেবার পর সে কঁকানি বন্ধ করে। শুধু ভুরু কুঁচকে অস্থির ভাবে অনবরত পা নাড়ে। দুই হাতে ক্ষত মুখটি চেপে সে একদৃষ্টে সামনে চেয়ে থাকে।

ডাক্তার আসে। গুলিটা পেছনে বেরিয়েছে কিনা দেখবার জন্য সে আহতকে কাত করতে বলে।

রোগীর পিঠে এবং কোমরে কয়েকটা লম্বা সাদা দাগ দেখে বলে, একি ?

আভদীপ কঁকিয়ে বলে, ও অনেকদিন আগেকার স্মর !

টাকা দিয়ে মদ খাবার অপরাধে আভদীপকে চাবুক মারা হয় ; এ তারই দাগ।

আবার আভদীপকে চিৎ করা হয়। ডাক্তার অনেকক্ষণ তার পেট পরীক্ষা করেন ; বুলেটের খোঁজও পাওয়া যায় কিন্তু বার করতে পারলেন না। তখন ক্ষতমুখ আটকে দিয়ে তিনি পট্টি বেঁধে দেন। ডাক্তার যতক্ষণ পরীক্ষা করে কিম্বা পট্টি বাঁধে, আভদীপ ততক্ষণ দাঁত কামড়ে চোখ বুজেই ছিল। সে চলে যাবার পর আভদীপ চোখ খোলে। অবাক দৃষ্টিতে তাকায় চারিদিকে। অন্যান্য রোগী এবং ডাক্তারের আরদালির দিকে সে চোখ ফেরায়, কিন্তু মনে হয় যেন অবাক বিস্ময়ে অন্য কিছু দেখছে।

তার বন্ধু পানভ আর সেরোগিন দেখা করতে আসে। আভদীপ কিন্তু তেমনি অবাক চোখেই চেয়ে থাকে। অনেকক্ষণ সরাসরি চেয়ে থাকলেও তাদের চিনতে বেশ কিছু সময় লাগে।

পানভ বলে, পেতর, বাড়ীতে কোন খবর দেবার আছে ?

আভদীপ জবাব করল না ; যদিও সে পানভের মুখের দিকেই চেয়েছিল।

বলছি বাড়ীতে কোন খবর পাঠাবে? আভদীপের ঠাণ্ডা চওড়া হাড়ওলা হাত ধরে আবার বলে পানভ।

আভদীপ যেন সংজ্ঞা ফিরে পায়।

আঃ……পানভ!

এই তো রয়েছি আমি! এই যে! বাড়ীতে কোন খবর পাঠাবে না? সেরোগিন লিখে দেবেখ'ন!

অতিকষ্টে সেরোগিনের দিকে চোখ ফিরিয়ে আভদীপ বলে, সেরোগিন লিখে দেবে? বেশ লিখে দাও। লেখো, তোমার পুত্র পেতর হুকুম করছে তোমরা দীর্ঘজীবী হও।* ভাইকে সে হিংসে করত……তার কথা আজকেই তোমাদের বলেছি…… এখন সে নিজে খুশি। তাকে উদব্যস্ত কর না……তাকে বাঁচতে দাও। ভগবান তাকে দীর্ঘজীবী করুন। আমি সুখী হব। এই কথা লিখে দিও।

এই কথা বলে পানভের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

হঠাৎ আবার জিজ্ঞাসা করে, তোমার পাইপটা পেয়েছিলে?

পানভ জবাব করল না।

তোমার পাইপ হে……তোমার পাইপ! বলছি, পেয়েছ কি? আবার বলে আভদীপ।

আমার ব্যাগেই ছিল।

---

* এই লোকপ্রচলিত কথার অর্থ—সংবাদ প্রেরক ইতিমধ্যেই মারা গেছে।

ভালই হয়েছে! হাঁ, আমার হাতে একখানা মোম দিয়ে যাও ……আমি মরতে চলেছি! আভদীপ বলে।

এই সময় পলতোরাতস্কি তার সৈন্যের খবর দিতে আসে। কেমন ঠেকছ ছোকরা? খারাপ? সে জিজ্ঞাসা করে।

আভদীপ চোখ বুজে মাথা নেড়ে জানায়—না। তার গাল চওড়া মুখখানা মলিন ও কঠোর হয়ে গেছে। পলতোরাতস্কির কথার জবাব সে দিল না, কিন্তু আবার পানভকে বল্ল, মোম নিয়ে এস……আমি মরতে চলেছি!

একখানা মোমবাতি তার হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু আঙুল বাঁকা হল না। কাজেই সেখানা আঙুলের ফাঁকে ভরে ধরে রাখা হয়। পলতোরাতস্কি চলে যায়। তার মিনিট পাঁচেক পরেই ডাক্তারের আরদালি তার বুকে কান দিয়ে বলে, সব শেষ হয়ে গেছে।

তিফলিসে যে রিপোর্ট পাঠান হয় তাতে আভদীপের মৃত্যুর এই বর্ণনা দেওয়া হয়ঃ

তেইশে নভেম্বর দুটি কুরিন রেজিমেণ্ট কেল্লা থেকে কাঠ কাটার অভিযানে যায়। দুপুর বেলা মস্ত একদল পাহাড়ে সহসা কাঠুরেদের আক্রমণ করে। শার্পসুটার দল পশ্চাদপসরণ করে, কিন্তু দুই নম্বর কোম্পানী সঙিন চার্জ করে পাহাড়েদের হটিয়ে দেয়। এই ঘটনায় দুটি সৈনিক সামান্য আহত এবং একজন নিহত হয়। পাহাড়েদের প্রায় শতাধিক লোক হতাহত হয়।

পেত্‌র আভদীপ যেদিন ভোজদভিজেনস্কির হাসপাতালে মারা যায়, তার বুড়ো বাপ সেদিন বড় পুত্র-বধূ অর্থাৎ যে ভাইয়ের বদলে পেতর পল্টনে যায় তার স্ত্রী এবং নাতনিকে নিয়ে ফসল মাড়াইর ঘরের জমাট শক্ত মেজেয় বসে জই ভাঙছিল। ভাইয়ের এই মেয়েটিও যুবতী হয়ে উঠেছে। তা প্রায় বিয়ে দেবার বয়স হয়েছে বললেই হয়।

আগের দিন রাত্রে প্রবল বরফ পড়ে; সকালের দিকেও আবার প্রচণ্ড তুষারকণা ঝড়ে। তৃতীয়বার মোরগ ডাকতে ডাকতেই বুড়ো উঠে পড়ে এবং স্তোভ থেকে নীচে নেমে বুট, ভেড়ার চামড়ার কোট আর টুপি পরে ফসল মাড়াইর ঘরে যায়। ঘণ্টা তুয়েক সেখানে কাজ করে ঘরে ফিরে সে পুত্র এবং মেয়েদের ঘুম ভাঙায়। বউ ও নাতনি ফসল মাড়াইর ঘরে এসে দেখে, কাঠের কোদাল দিয়ে চেঁচে মেজে পরিষ্কার করা হয়েছে। শুকনো সাদা বরফের উপরে খাড়া হয়ে আছে কোদালখানা। তার পাশে বার্চ পাতার ঝাঁটা উল্টোভাবে খাড়া করে রাখা হয়েছে। আর গোটা পরিচ্ছন্ন মেজেয় তুটো লম্বা সারে লাগোয়া-ভাবে সাজান রয়েছে জই-এর আঁটি। ফ্লেল* বেছে নিয়ে তারা শস্য আঁচড়াবার কাজ শুরু করে দেয়। তুজনেই বেশ তাল রেখে তিন তিনটে করে বাড়ি মারছে। বৃদ্ধ তার ভারী ফ্লেলের প্রচণ্ড ঘায়ে খড় ভেঙে দিচ্ছে। মেয়েটি উপর থেকে মাপা বাড়ি মারছে শস্যের শীষে। আর পুত্রবধূ জই উলটে দিচ্ছে তার ফ্লেল দিয়ে।

(১) ফ্লেল : ফসল মাড়াইর যন্ত্র; একটা কাঠের বাটের মাথায় খাটো ভারি একখণ্ড লাঠি ঝোলান থাকে।

চাঁদ অস্ত গেছে। প্রভাত হয়-হয়। তিনজন জইর আঁটির সারিটি শেষ করবার মুখেই বড় ছেলে আকিম ভেড়ার ছালের কোট আর টুপি পরে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

কাজ থামিয়ে ফ্লেলের পর ভর করে বৃদ্ধ খেঁকিয়ে ওঠে, কুড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন?

ঘোড়া কটাও দেখতে হবে তো!

ঘোড়া কটা দেখতে হবে তো! পুত্রের স্বর নকল করে বৃদ্ধ বলে। কেন, বুড়ীই তো রয়েছে!···চটপট তোর ফ্লেল নে। মাতলামি করে দিন দিন মুটিয়ে যাচ্ছিস!

নিজে দাঁড়িয়ে খাইয়েছ বুঝি?

কি বল্লি? ভ্রূকুটি করে খেঁকিয়ে ওঠে বৃদ্ধ। একটা বাড়ি ভুল হয়ে যায়!

নীরবে ফ্লেল তুলে নিয়ে ছেলে কাজ শুরু করে। চার চারটে ফ্লেলে কাজ চলে তখন।

আর তিনজনের বাড়ির পর বৃদ্ধের ভারি ফ্লেলে শব্দ হয়—ট্রাক টপাটম···ট্রাক টপাটম···ট্রাক······

হাঁরে, ঘাড়ের পেছনটা দেখি ভদ্দর লোকের মতই করেছিস। চেয়ে ত্যাখ্, আমার ইজের আটকাবার কিছু নেই বল্লেই হয়! ছেলেকে লক্ষ্য করে বলে বৃদ্ধ। আবারও একটা বাড়ি বাদ পড়ে। কিন্তু তাল রাখবার জন্য ফ্লেলটা সে ঠিক মত শূন্যে তোলে।

সারির কাজ শেষ হয়ে যায়। মেয়েরা তখন কাঁটাওলা আঁচড়াবার যন্ত্র দিয়ে খড় সরিয়ে দিতে আরম্ভ করে।

পেতর বোকা বলে তোর বদলে গেছে। পল্টনে গেলে গাট্টা মেরে তোর বোকামি বের করে দিত। বাড়ীতে সে তোর মত পাঁচটার কাজ করতে পারত।

ঢের হয়েছে বাবা। আঁটির বাঁধুনিগুলি একপাশে সরিয়ে দিতে দিতে পুত্রবধূ বলে।

ছ' ছটাকে গেলাচ্ছি কিন্তু একটাও কাজের নয়। দুজনের কাজ একা করত পেতর। সে তোদের মত……

এই সময় বৃদ্ধা এসে হাজির হয়। চলাচলের পথ ধরেই ঘর থেকে এসেছে বুড়ী। আঁটসাটভাবে জড়ান পশমী ব্যাণ্ডের উপর নতুন গাছের ছালের জুতো পরা। জমাট বরফ তার চাপে চুরমুর করে উঠছে। মরদেরা তখন কোদল দিয়ে আ-ঝাড়া শষ্য টাল দিচ্ছিল; আর পুত্রবধূ এবং মেয়েটি ঝাঁট দিয়ে বাকী শষ্য জড়ো করছিল। বৃদ্ধা বলে, মোড়ল এসেছিল, মালিকের জন্য কাজে যেতে বলে গেছে। গাড়িতে ইট বোঝাই করতে হবে। প্রাতরাশ আমি তৈরি করেছি…চলে এস, কেমন!

বৃদ্ধ তখন আকিমকে বলে, ঠিক আছে, ডোরাকাটা রাঙাটে ঘোড়াটা নিয়ে তুই চলে যা। দেখিস, সেদিনকার মত আমায় ঝামেলায় ফেলিস না যেন! …পেতর চলে যাওয়ার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

সে বাড়ী থাকতে তাকে গালাগালি করেছ, আর যখন সে চলে গেল তখন থেকে আমায় খোঁচাচ্ছ। ছেলে বলে ওঠে।

তার মানে তোর স্বভাবই এমনি যে গালাগাল না করে পারা যায় না। মাও তেমনি রুক্ষগলায় বলে ওঠে।—পেতরের সমান কোন কালেই হতে হবে না তোকে।

যা বলেছ! ছেলে বলে।

ঠিকই বলেছি। খোরাকির পয়সা মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়ে এখন বলছেন যা বলেছ! পুত্রবধূ তখন বাধা দিয়ে বলে, অতীতের কথা ভুলে যান!

বাপ-ছেলের এই মতান্তর অনেকদিন ধরেই চলছে। প্রায় পেতর পল্টনে যাবার সময় থেকে। তখনও বৃদ্ধের মনে হয়েছে যে ঈগলের বদলে তিনি কোকিল রাখলেন। বৃদ্ধের ধ্যান ধারণা অনুসারে কথাটা ঠিক। কেননা সন্তানের পিতার বদলে এক নিঃসন্তানকে যেতে হল। আকিমের চারিটি সন্তান—পেতরের একটিও নেই। কিন্তু কাজকর্মে পেতর বাপের মতই—কুশলী, তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন, বলবান, ধৈর্যশীল এবং পরিশ্রমী। সব সময় সে কাজে লেগে থাকত। কোন লোক কাজ করবার সময় পাশ দিয়ে যদি সে যেত তো বাপের মত সে লোকটির সাহায্য করত; হয়ত কাস্তে নিয়ে দু-এক পক্কর দিল, কি গাড়ি বোঝাই করে দিল, কি একটা গাছ কেটে দিল কিম্বা কিছুটা চেলা কাঠ কেটে দিল। তার চলে যাওয়ায় বৃদ্ধ সত্যিই দুঃখিত, অথচ উপায়ও ছিল না। সেকালকার রঙরুট মৃত্যুর সামিল। সৈনিকেরা কাটা ডালের মত। বাড়ীতে বসে তাদের কথা ভাবার অর্থ অকারণ নিজেকে কষ্ট দেওয়া। তাই মাঝে মাঝে বড় ছেলেকে

খোঁচা দেবার জন্য বৃদ্ধ তার কথা উল্লেখ করে। আজও সেই ভাবেই করেছে। মা কিন্তু বরাবরই ছোট ছেলের কথা ভাবে। বহুদিন ধরে, প্রায় বছর খানেক হয়ে এল পেতরকে সামান্য কিছু অর্থ পাঠাবার কথা সে বলে আসছে। কিন্তু বৃদ্ধ হুঁ-হাঁ করেনি।

কুরেনকভরা বেশ সম্পন্ন পরিবার। কিছু গোপন সঞ্চয়ও আছে বুড়োর। কিন্তু যা পুঁতে রাখা হয়েছে, কোন কারণেই বৃদ্ধ তাতে হাত দিতে রাজী নয়। আবার ছোট ছেলের কথা ওঠায় বৃদ্ধ ভাবল, জই বেচার পর এইবার অন্তত একটি রুবল পাঠাতে সে অনুরোধ করবে। করলও। অল্পবয়স্কেরা মালিকের জন্য কাজ করতে গেলে বাড়ীতে রইল শুধু বুড়ো-বুড়ী। এই সুযোগে বুড়োকে সে জই-বেচা টাকা থেকে একটি রুবল পেতরকে পাঠাতে রাজী করায়।

কাঠের শলা দিয়ে সযত্নে মুখ সেলাই করা থলেতে ভরে ছিয়ানব্বুই বুশেল জই তিনখানা শ্লেগায় বোঝাই করা হল। বৃদ্ধা এসে স্বামীর হাতে একখানা চিঠি দেয়। নিজের বয়ানে চিঠিখানা সে গীর্জার কেরাণীকে দিয়ে লিখিয়েছে। বৃদ্ধ কথা দেয় যে শহরে গিয়ে চিঠির মধ্যে রুবল ভরে সে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবে।

বৃদ্ধের গায়ে ভেড়ার চামড়া—তার উপর তাঁতে বোনা ক্লোক জড়ান। পায়ে জড়ান গরম সাদা পশমী ব্যাণ্ড। চিঠিখানা নিয়ে সে পকেটে রেখে দেয়; তারপর প্রার্থনা করে সামনের

স্লেগায় চড়ে বসে। শেষের স্লেগাখানা চালাচ্ছে পৌত্র। শহরে পৌঁছে বৃদ্ধ হোটেলওলাকে চিঠিখানা পড়ে শোনাতে বলে এবং মনোযোগ দিয়ে পত্র শুনে সায় দেয়।

চিঠিতে পেতরের মা প্রথম তার আশীর্বাদ পাঠিয়েছে, তারপর জানিয়েছে পরিবারের সকলের সাদর সম্ভাষণ, তারপর লিখেছে পেতরের ধর্মপিতার মৃত্যু সংবাদ। শেষে লিখেছে পেতরের স্ত্রী আকসিনিয়ার কথা ঃ সে তাদের পরিবারে থাকতে চায়নি, অন্যত্র কাজ নিয়ে চলে গেছে এবং সেখানে সে সদ্ভাবে ভালই আছে শোনা যায়। তারপর জানান হয়েছে রুবলটির সংবাদ। পরিশেষে ব্যথাতুর বৃদ্ধা মা শাশ্রুনয়নে এক করুণ আকুতি জানিয়েছে। গীর্জার কেরাণী হুবহু সেই কথা কটি লিখে দিয়েছে ঃ

আর এক কথা, আমার প্রাণ, আমার সোনামণি, আমার পেতরকিন! তোর জন্য কেঁদে কেঁদে আমি সারা হলাম। তুই আমার চোখের মণি। কার কাছে আমায় ফেলে গেছিস? এই কথা বলে বৃদ্ধা ফুঁপিয়ে কেঁদেছে; তারপর বলেছে, ব্যস্‌ এতেই হবে! পত্রেও এই ভাবেই লেখা আছে। কিন্তু স্ত্রীর বাড়ী ছেড়ে যাবার সংবাদ, মায়ের পাঠান রুবল কিম্বা তার শেষ কথা শুনে যাওয়া পেতরের বরাতে হল না। রুবল সহ পত্রখানি ফিরে আসে; সেই সঙ্গে এই ঘোষণাও আসে যে জার ও পিতৃভূমির সেবায় এবং ধর্মরক্ষার্থে পেতর রণক্ষেত্রে নিহত হয়েছে। পল্টনের কেরাণী এইভাবেই সংবাদটি জানায়।

এই সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধা কেঁদে ভাসিয়েছে। যতক্ষণ বসে থাকা চলে শুধু কেঁদেছে। তারপর আবার কাজে লেগে গেছে। পরের রবিবারেই গীর্জায় গিয়ে সে মৃত পুত্রের শান্তির জন্য প্রার্থনা করায়। যাদের আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করতে হবে, এরপর পেতরের নাম তাদের তালিকায় স্থান পায়। ভগবানের দাস পেতরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সজ্জনদের মধ্যে সে পবিত্র রুটির টুকরোও বিলি করে।

প্রাণপ্রিয় স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনে বিধবা আকসিনিয়াও চীৎকার করে কেঁদে বুক ভাসায়। যদিও স্বামীর সঙ্গে বসবাস সে করেছে মাত্র এক বছর। স্বামীর জন্য, নিজের অভিশপ্ত জীবনের জন্য সে শোক করে এবং শোকচ্ছাসের মুখে পেতরের কটা চুল, তার ভালবাসা এবং পিতৃহীন শিশু ভাংকাকে নিয়ে তার নিজের দুর্দশার কথা উল্লেখ করে বিলাপ করে। বড় ভাইয়ের প্রতিই তার যত মমতা—আকসিনিয়ার উপর কোন মায়া তার ছিল না তাই তাকে নির্বান্ধবের মধ্যে অসহায়ের মত ফেলে গেছে—এই সব কথা বলেও সে পেতরকে ধিক্কার দেয়।

লোক দেখান শোক করলেও স্বামীর মৃত্যু-সংবাদে প্রাণে প্রাণে আকসিনিয়া খুশিই হয়েছে। যে দোকানদারের সঙ্গে সে আছে, এই দ্বিতীয়বার তার ঔরসে আকসিনিয়া গর্ভবতী হয়েছে। এখন আর কেউ তাকে তিরস্কার করতে পারবে না। দোকানদার এখন তাকে বিয়ে করবে, কেননা এপথে তাকে নামাবার জন্য যখন ফুসলায় তখনতো সেই কথাই বলেছে।

রুশ রাজদূতের ছেলে বলে মিখাইল সেমিনোভিচ ভরন্তসভ ইংলণ্ডেই লেখাপড়া শেখেন। যে য়ুরোপীয় শিক্ষা তিনি পেয়েছেন, তৎকালীন উচ্চপদাধিকারী রুশ রাজকর্মচারী মহলে তেমন শিক্ষা সুদুর্লভ। ভরন্তসভ উচ্চাভিলাষী। অধীনস্থদের সঙ্গে তার আচরণ ভদ্র ও সদয়; কিন্তু উপরিওলাদের সঙ্গে ব্যবহার অতিমার্জিত। ক্ষমতা ও অধীনতা ছাড়া জীবনের অপর কোন অর্থ তার কাছে নেই। উচ্চতম সমস্ত পদই তিনি পেয়েছেন, সম্মানসূচক পুরস্কারও পেয়েছেন প্রচুর। লোকে তাকে চতুর সেনাধ্যক্ষ বলেই জানে, এমন কি ক্রাশনোতে (১) নেপোলিয়নের বিজেতা বলেও গণ্য করে।

আঠারোশ' বায়ান্ন সালে তাঁর বয়স সত্তরের ঊর্ধে। কিন্তু দেখায় বয়সের তুলনায় ছোট। এখনও চটপট করে তিনি চলাফেরা করেন। সর্বোপরি যে বহুমুখী মার্জিত মধুর বুদ্ধির তিনি অধিকারী, এ বয়সেও তা অম্লান। সে বুদ্ধিকে আজও তিনি ক্ষমতা করায়ত্ত রাখতে এবং জনপ্রিয়তা শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করতে প্রয়োগ করে যাচ্ছেন। নিজের ও স্ত্রীর সম্পত্তি মিলিয়ে বিপুল বৈভবের অধিকারী তিনি। এককালে তার স্ত্রী কাউণ্টেস ব্রানিতস্কি ছিলেন। রাজপ্রতিনিধি হিসাবেও তিনি

---

(১) স্মোলেনস্কের দক্ষিণ-পশ্চিমে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত শহর। এইখানে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মস্কো থেকে পশ্চাদপসরনের পথে নেপোলিয়নের বাহিনীর পশ্চাদব্যূহের সৈন্যদল পরাজিত হয়।

প্রচুর বেতন পেতেন। ক্রাইমিয়ার দক্ষিণ উপকূলে এক প্রাসাদ ও বাগান তৈরীর জন্য অপরিমিত অর্থ ব্যয় করেছেন ভরন্তসভ।

১৮৫২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এক বার্তাবহের ট্রোইকা-গাড়ি তিফলিসে তার প্রাসাদের সামনে আসে। হাজি মুরাদের আত্মসমর্পণের সংবাদসহ জেনারেল কোজলভস্কি প্রেরিত ক্লান্ত ধূলিমলিন এক অফিসার প্রশস্ত বারান্দায় প্রবেশ করে এবং প্রহরীর সামনে দিয়ে যাবার সময় পায়ের শ্রান্ত পেশী টান করে চলে যায়। বেলা তখন ছটা বাজে। ডিনার পার্টিতে যাবার জন্য ভরন্তসভ সবে রওনা হয়েছেন। এই সময় তাকে বার্তাবহের আগমন সংবাদ দেওয়া হয়। কাজেই ভোজ সভায় যেতে তার মিনিট কয়েক বিলম্ব হয়।

ত্রিশজন নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ প্রিন্সেস এলিজাবেত কাসাভেরভনা ভরন্তসভার পাশে বসে আছে, আর কেউবা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। ভরন্তসভ ড্রয়িংরুমে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে ফিরে তাকায়। ভরন্তসভের গায়ে সামরিক কালো কোট। সাধারণতঃ এই কোটই তিনি পরেন। কাঁধে রজ্জুগ্রন্থি আছে কিন্তু কোন তাজ সেই। গলায় ঝুলছে সেণ্ট জর্জ অর্ডারের সাদা ক্রশ।

তার গোঁফ-দাড়ি কামান বুদ্ধিদীপ্ত চতুর মুখে মিঠে হাসি। চোখ কুঁচকে তিনি অভ্যাগতের লক্ষ্য করেন। নিঃশব্দে চটপট ঘরে ঢুকে বিলম্বের জন্য প্রথমেই তিনি মহিলাদের কাছে মার্জনা চান; তারপর প্রিন্সেস মানানা অরবেলাইয়ানি নামে লম্বা

ছিপছিপে প্রাচ্য ধরণের সুদর্শনা বছর পয়তাল্লিশ বয়সের এক মহিলার কাছে এগিয়ে তাকে ডিনার হলে নিয়ে যাবার জন্য বাহু বাড়ান। প্রিন্সেস এজিলাবেত কসাভেরেভনা ভরন্তসভা বাহু দেন লাল চুল খোঁচা খোঁচা গোঁফওলা এক জেনারেলকে। লোকটি সম্প্রতি তিফলিসে এসেছে। এক জার্জিয়ান রাজকুমার বাহু দেয় প্রিন্সেস ভরন্তসভার বান্ধবী কাউণ্টেস চইসেলকে। ডাঃ আন্দ্রিভস্কি, পার্শ্বচর এবং আর সবাই সঙ্গে মহিলা থাক বা না থাক, এই তিন জোড়ার অনুগমন করে। হাঁটু অবধি ব্রিচেজ এবং তকমা পরা খানসামারা সরে দাঁড়ায় এবং অতিথিরা বসবার সময় চেয়ার এগিয়ে দেয়। প্রধান পরিচারক এই সময় রূপোর স্যুপ-পাত্র থেকে ধোঁয়ান ঝোল ঢালে।

লম্বা টেবিলের একপাশের মাঝখানে বসেন ভরন্তসভ। তার স্ত্রী বসেন বিপরীত দিকে তার মুখোমুখি। জেনারেলটি বসে তার ডান পাশে। আর ভরন্তসভের ডানপাশে বসে তার 'লেডি' —সুন্দরী অরবেলিয়ানি। প্রিন্সের বাঁ পাশে বসেছে জড়োয়ার গহনা পরা রঙ ময়লা গাল লাল লাবণ্যময়ী এক জর্জিয়ান মহিলা। প্রতিনিয়ত হাসছে মহিলাটি।

দূত কি সংবাদ নিয়ে এসেছে স্ত্রীর এই জিজ্ঞাসার জবাবে ভরন্তসভ ফরাসীতে বলেন, চমৎকার, মাইডিয়ার! সিমনের জোর বরাত। অতঃপর তিনি গলা চড়িয়ে বিস্ময়কর সংবাদটি শোনানঃ সামিলের সব চাইতে সাহসী সুপ্রসিদ্ধ অফিসার হাজি মুরাদ রুশপক্ষে চলে এসেছে এবং দু একদিনের মধ্যেই

তাকে তিফালসে নিয়ে আসা হবে। তার কাছে অবশ্য সংবাদটি ততটা বিস্ময়কর নয়। কেননা আলাপ আলোচনা তো অনেকদিন ধরেই চলছে।

সকলেই নীরবে কথাটা শোনে। টেবিলের দূরপ্রান্তে বসা অফিসাররা নিজেদের মধ্যে কি একটা জিনিস নিয়ে নিঃশব্দে হাসাহাসি করছিল। সংবাদ শুনে তারা পর্যন্ত নীরব হয়।

আপনি কখনও এই হাজি মুরাদকে দেখেছেন জেনারেল? খোঁচা খোঁচা গোঁফগুলা গাজরের মত রঙ জেনারেলকে জিজ্ঞাসা করেন ভরন্তসভা।

একাধিকবার প্রিন্সেস!

১৮৪৩ সালে পাহাড়েরা গেরগেবল দখল করার পর হাজি মুরাদ জেনারেল পাহলেনের সৈন্যদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেমন করে কর্নেল জলোতুখিনকে তাদের চোখের সামনে হত্যা করেছিল, অতঃপর তার গল্প শোনায় জেনারেল।

ভরন্তসভ নিবিষ্টমনে জেনারেলের বর্ণনা শোনেন এবং কথা শেষ হলে প্রসন্নভাবে হাসেন। বেশ বোঝা যায় যে জেনারেল এ আলোচনায় যোগ দেওয়ায় তিনি খুশিই হয়েছেন। কিন্তু সহসা তার মুখে একটা আনমনা বিষণ্ণভাব দেখা দেয়।

গল্প শুরু করে জেনারেল তখন হাজি মুরাদের সঙ্গে তার দ্বিতীয় সাক্ষাতের কাহিনী বলে।

আপনার হয়ত স্মরণ আছে ইওর একসেলেনসি, বিস্কুট অভিযানের বাহিনীকে উদ্ধারের জন্য যে দলটি পাঠান হয়,

এই হাজি মুরাদই তো দলবল নিয়ে অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করে।

কোথায়? চোখ কুঁচকে ভরন্তসভ জিজ্ঞাসা করেন।

বাহাদুর জেনারেল যাকে উদ্ধারকার্য বলে বর্ণনা করে, সে ঘটনা ঘটেছিল বেদনাদায়ক দারগো অভিযানে। প্রিন্স ভরন্তসভ এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। স্বয়ং প্রিন্সসহ গোটা একটা বাহিনী ধ্বংস হয়ে যেত যদি সময় মত নতুন সৈন্যদল এসে উদ্ধার না করত। প্রিন্স ভরন্তসভের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে রুশপক্ষের বহু সৈন্য নিহত ও আহত হয়। কামানও বেহাত হয় গোটা কয়েক। সবাই জানে ব্যাপারটা শেষ অবধি এক চরম কেলেঙ্কারিতে পর্যবসিত হয়। কাজেই কেউ যদি ভরন্ত-সভের সামনে ব্যাপারটির উল্লেখ করত তো জারের কাছে যেভাবে তিনি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, সেইভাবেই তার বর্ণনা করত। অর্থাৎ ঘটনাটিকে রুশ বাহিনীর অপূর্ব সাফল্য বলেই অভিহিত করত। কিন্তু উদ্ধার শব্দটি ব্যবহার করায় স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ঘটনাটি আদতে কোন অপূর্ব সাফল্য নয় বরং তার উলটো, মানে বহু প্রাণহানিকর এক চরম কেলেঙ্কারি। সবাই কথার তাৎপর্য বুঝল। কেউ কেউ না বুঝবার ভান করল। আর বাকী সবাই ঘাবড়ে গিয়ে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে। কেউ কেউ আবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে মুচকি হাসে। শুধু খোঁচা খোঁচা গোঁফগুলা গাজরের মত রঙ জেনারেলের চোখেই কিছু ধরা পড়ল না। গল্পের নেশায় কোন

কিছু খেয়াল না করে ধীরে জবাব দেয়, উদ্ধারের জন্য ইওর একসেলেনসি।

নিজের প্রিয় কাহিনী বলতে শুরু করে প্রসঙ্গক্রমে জেনারেল বলে যে, হাজি মুরাদ এমন সুকৌশলে সেনাবাহিনীকে দুভাগ করে দিয়েছিল যে সময় মত উদ্ধারের দল না পৌঁছোলে গোটা ডিভিসনের একজনকেও প্রাণ নিয়ে ফিরতে হত না। লোকটা বারবার এমনভাবে উদ্ধার শব্দটা ব্যবহার করছিল যেন শব্দটা ওর খুবই প্রিয়। কিন্তু সে গল্প শেষ করতে না করতেই মানানা অরবেলিয়ানি অবস্থা বুঝে তাকে জিজ্ঞাসা করে যে তিফলিসে সে ভাল বাসা পেয়েছে কিনা। বিস্মিত জেনারেল তখন সবার মুখের দিকে তাকায়। দেখে, তার পার্শ্বচর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। চট করে তার খেয়াল হয়। প্রিন্সেসের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ভ্রূকুটি করে সে চুপ করে যায় এবং গপ্‌ গপ্‌ করে সামনের উপাদেয় খাবার গিলতে থাকে। অবিশ্যি খাবারের চেহারা ও স্বাদ দুটোই তাকে অবাক করেছে।

সকলেই তখন অস্বস্তিবোধ করে। জর্জিয়ার রাজকুমারের দরুণ বিচ্ছিরি অবস্থাটা হালকা হয়ে যায়। লোকটা গবেট হলেও বেশ মার্জিত বাকচতুর চাটুকার পারিষদ। প্রিন্সেস ভরন্তসভার বিপরীত দিকে বসেছে সে। কোন কথাই সে খেয়াল করেনি এমনি ভান দেখিয়ে বলতে শুরু করে, হাজি মুরাদ কেমন করে মেখতুলির আখমত খাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

রাত্রে সে গ্রামে হানা দেয় এবং হাতের কাছে যা পেল তাই লুটেপুটে দলবল নিয়ে আবার চলে যায়।

প্রিন্সেস জিজ্ঞাসা করেন, এই স্ত্রীলোকটিকেই বিশেষ করে সে চেয়েছিল কেন?

এই কথা! তার স্বামী ছিল হাজি মুরাদের দুশমন। বরাবর তাঁর খোঁজ করেছে, কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত কোনদিন তার দেখা পায়নি। তাই স্ত্রীর উপর শোধ তুলল!

বহুদিনের বান্ধবী কাউন্টেস চইসেলের জন্য প্রিন্সেস কথাটা ফরাসীতে তর্জমা করে শোনান। রাজকুমারের পাশেই বসেছিল মহিলাটি।

চোখবুজে মাথা ঝেঁকে মহিলাটি বলে ওঠে, কি ভয়ানক ব্যাপার!

না, না! ভরন্তসভ হেসে বলেন।—আমি শুনেছি, বন্দিনীর সঙ্গে সে সিভালরাস্ বীরের মত সশ্রদ্ধ আচরণ করে এবং পরে তাকে মুক্তি দেয়।

দেয় বটে, তবে অর্থের বিনিময়ে!

তা বটে! তাহলেও মর্যাদাহানিকর কোন ব্যবহার করেনি।

ভরন্তসভের এই কথা আলোচনার ধারা বদলে দেয়। পারিষদরা বুঝতে পারে যে হাজি মুরাদের গুণগান করলেই প্রিন্স খুশি হবেন।

লোকটার দুঃসাহস বিস্ময়কর! অদ্ভুত লোক!

কেন মনে নেই, ১৮৪৯ সালে হুট করে তেমিক খাঁ সুরাতে এসে প্রকাশ্য দিবালোকে দোকানপাট লুট করে চলে যায়!

টেবিলের একপ্রান্তে এক আর্মানি বসা ছিল। লোকটি এই সময় ছিল তেমির খাঁ সুরাতে। সবিস্তারে সে হাজি মুরাদের সেই বাহাদুরির বর্ণনা শোনায়।

বস্তুতঃ ডিনারের সময় হাজি মুরাদ প্রসঙ্গই একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয়ে পড়ে।

বারবার সকলেই তার সাহস কৌশল ও মহানুভবতার প্রশংসা করে। একজনে তার ছাব্বিশজন বন্দী হত্যার হুকুমের উল্লেখ করে। কিন্তু সে মন্তব্যেরও প্রতিবাদ করা হয়।—কি করা যায়? যুদ্ধ যুদ্ধ!

বিরাট লোক!

চাটুকারিতায় পারদর্শী গবেট জর্জিয়ার রাজকুমার বলে ওঠে, য়ুরোপে জন্মালে হয়ত আর এক নেপোলিয়ন হতে পারত।

লোকটা জানে যে নেপোলিয়নের নামোল্লেখেও প্রিন্স খুশি হন। তাকে পরাজিত করবার পুরস্কারেই তো প্রিন্সের গলায় সাদা ক্রশ ঝুলছে!

না ঠিক নেপোলিয়ন নয়, তবে দুঃসাহসী এক অশ্বারোহী-দলের জেনারেল হতে পারত বলতে পারেন। ভরন্তসভ বলেন।

নেপোলিয়ন না হলে মুরাত তো হতে পারত!

ওর নামও তো হাজি মুরাদ।

এই সময় কে একজন বলে ওঠে, হাজি মুরাদ যখন আত্ম-সমর্পণ করেছে, এইবার শামিলও খতম হয়ে যাবে।

হাঁ এখন টের পাবে, আর প্রতিরোধ করতে হবে না! আর একজন বলে ওঠে।

মানানা অরবেলায়ানি ফরাসীতে বলে, এর সব কিছুই আপনার কৃতিত্ব।

চাটুকারিতার উচ্ছসিত ঢেউ এতক্ষণ যেভাবে তার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে, ভরন্তসভ তার তোড় খানিকটা কমাবার চেষ্টা করেন। তাহলেও শুনতে তো ভালই লাগে! অত্যন্ত খোস মেজাজে তার লেডিকে নিয়ে তিনি ড্রয়িংরুমে ফিরে আসেন।

ডিনারের পর ড্রয়িংরুমে যখন কফি দেওয়া হয়, সবাইর সঙ্গেই প্রিন্স বিশেষ মিষ্টি ব্যবহার করেন। খোঁচা খোঁচা গোঁফগুলা জেনারেলের কাছে গিয়ে তিনি এমন ভাব করেন যেন তার অনবধানতা তিনি খেয়াল করেননি।

সমস্ত অভ্যাগতদের কাছে এক পক্কর দিয়ে তিনি তাসের টেবিলে বসেন। তাস খেলার মধ্যে তিনি সেকেলে অম্বার খেলাই জানতেন। খেলায় তার জুটি ছিল জর্জিয়ার রাজকুমার, এক আর্মানি জেনারেল (ভরন্তসভের খানসামার কাছ থেকে সে খেলাটা শিখে নিয়েছে) এবং ডাঃ আন্দ্রিভস্কি। ভরন্তসভের উপর অসীম প্রভাব এই লোকটার।

প্রথম আলেকসান্দারের ছবি-আঁকা সোনার একটা নস্যির কৌটো পাশে রেখে তিনি চকচকে একজোড়া নতুন তাসের

বাক্স ছিঁড়ে ফেলেন। তাস বাঁটবার সময় তার ইতালীয় খানসামা জিওভান্নি রূপোর ট্রেতে করে একখানা চিঠি নিয়ে আসে।

আর এক বার্তাবহ এসেছে ইওর একসেলেনসি!

ভরন্তসভ তাস জোড়া রেখে দেন এবং জুটিদের কাছে মাফ চান; তারপর চিঠিখানা খুলে পড়তে আরম্ভ করেন।

পুত্র লিখেছে চিঠিখানা। হাজি মুরাদের আত্মসমর্পণ এবং মেলার জাকোমেলস্কির সঙ্গে তার নিজের কথা কাটাকাটির বিষয় লিখেছে।

প্রিন্সেস এগিয়ে এসে ছেলে কি লিখেছে জানতে চান। —সবই এক বিষয়ে……স্থানীয় কমাণ্ডাণ্টের সঙ্গে তার খানিকটা বচসা হয়েছে। সিমনই ভুল করেছে। যাই হোক, সব ভাল যার শেষ ভাল! স্ত্রীর হাতে পত্রখানা দিয়ে ইংরেজীতে তিনি কথা শেষ করেন। তারপর শ্রদ্ধাবান তাসের জুটিদের দিকে ফিরে তাদের বাঁটতে বলেন।

প্রথমবার তাস দেওয়া হয়ে গেলে খোস মেজাজে বরাবর তিনি যা করে থাকেন এখনও তাই করলেন। এক টিপ ফরাসী নস্য নিয়ে নাকে ভরে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো ছিটিয়ে দিলেন নাক ঝেড়ে।

পরদিন হাজি মুরাদ প্রিন্সের প্রাসাদে আসে। বসবার ঘর ইতিপূর্বেই দর্শনার্থীর ভীড়ে থৈ থৈ করছে। কালকের খোঁচা

খোঁচা গোঁফগুলা জেনারেল সামরিক উর্দি এবং রাজমর্যাদাসূচক যাবতীয় প্রতীক পরে এসেছে বিদায় নেবার জন্য। রসদখানার অর্থ আত্মসাৎ করার অপরাধে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত রেজিমেন্টের এক কমাণ্ডারও উপস্থিত আছে। আর আছে ডাঃ আন্দ্রিভস্কির পৃষ্ঠপোষিত এক ধনী আর্মানি। সে এসেছে ভোদকা বিক্রীর একচেটিয়া অধিকারের মেয়াদ সরকারের কাছ থেকে বাড়িয়ে নেবার আশায়। যুদ্ধে নিহত এক অফিসারের কালোপোশাকপরা বিধবা স্ত্রীও আছে। সে এসেছে পেন্সনের আবেদন নিয়ে কিম্বা সন্তান-সন্ততির অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে। চটকদার জর্জিয়ান বেশবাস পরা সম্পত্তিহারা এক জর্জিয়ান রাজকুমার এসেছে কিছু গীর্জার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার তালে। ককেসাস অঞ্চল ভালভাবে করায়ত্ত করার পরিকল্পনা সহ গুচ্ছের দলিল পত্র নিয়ে এক অফিসারও বসে আছে ঘরে। আর একজন খাঁ সাহেবও আছে। তার আসার উদ্দেশ্য, দেশে ফিরে যাতে দশজনের কাছে সে বলতে পারে যে প্রিন্সের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে!

সবাই নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করছে। এক এক জনকে প্রিন্সের কাছে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে আবার একটু বাদেই মন্ত্রণা-কক্ষের বাহিরে নিয়ে আসছে। সুদর্শন সুকেশ যুবক পার্শ্বচরটি।

পা টেনে হাজি মুরাদ যখন গটমট করে বসবার ঘরে ঢোকে, সকলেই তার দিকে তাকায়। ঘরের সর্বত্র তার নাম ফিসফিস করে উচ্চারিত হচ্ছে বলে কানে আসে।

কলারে সূক্ষ্ম রূপার কাজকরা বাদামি একটা বেশমেতের পর লম্বা সাদা একটা সিরকাজীয় কুর্তা তার গায়ে। পায়ে আঁটসাঁট কালো জুতো আর কালো পট্টি। মাথায় পাগড়ির মত একটা উঁচু টুপি। আখমত খাঁর অভিযোগের পর জেনারেল ক্লুগেনাউ যখন তাকে বন্দী করে এবং যে জন্য সে শামিলের পক্ষে যায়, তখনও এই টুপিই পরা ছিল।

বসবার ঘরের হরেক রকম কাঠ দিয়ে তৈরী মেজের উপর দিয়ে সে গটমট করে হেঁটে এগোয়। একটা পা একটু খাটো বলে পা টেনে হাঁটবার সময় ছিপছিপে দেহ ঈষৎ হেলে পড়ে। তার দূর-সন্নিবিষ্ট চোখে প্রশান্ত দৃষ্টি। সরাসরি সামনের দিকে চেয়ে আছে। যেন কাউকেই লক্ষ্য করছেনা।

সুদর্শন পার্শ্বচরটি তাকে সংবর্ধনা করে এবং বসবার অনুরোধ করে প্রিন্সের কাছে খবর জানাতে চলে যায়। হাজি মুরাদ বসতে অস্বীকার করে। ছোরার পর হাত রেখে একপা সামনে এগিয়ে ঘরে উপস্থিত সকলের দিকে অবজ্ঞেয় দৃষ্টিতে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রিন্সের দোভাষী প্রিন্স তারখানভ এগিয়ে এসে হাজি মুরাদের সঙ্গে কথা বলে। অনিচ্ছায় কাটা কাটা জবাব দেয় হাজি মুরাদ। পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার জন্য এক কুমিক সামন্ত এসেছিল। সে প্রিন্সের ঘর থেকে বেরুতেই পার্শ্বচর হাজি মুরাদকে ডাকে এবং মন্ত্রণাকক্ষের দরজায় নিয়ে এসে ভেতরে যাবার ইঙ্গিত করে।

টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে প্রধান সেনাপতি হাজি মুরাদকে সংবর্ধনা করেন। কালকের সে হাসি তার মুখে নেই, কেমন গম্ভীর ভাব যেন।

সবজে সার্সি লাগান প্রশস্ত কক্ষের বিরাট টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হাজি মুরাদ বক্ষস্থলে হাত দেয় এবং হেঁট মাথায় কোন তাড়াহুড়া না করে স্পষ্ট সশ্রদ্ধ ভঙ্গীতে কুমিক ভাষায় বক্তব্য জানায়। ভাষাটি সে ভালভাবেই জানে।

সে বলে, মহান জার এবং আপনার শক্তিশালী রক্ষণাধীনে আমি নিজেকে সমর্পণ করছি। শপথ করছি যে আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বিশ্বস্তভাবে শ্বেত জারের সেবা করব। আমার বিশ্বাস, আপনাদের এবং আমার শত্রু শামিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমি কাজে লাগব।

দোভাষীর তর্জমা শুনে ভরন্তসভ হাজি মুরাদের দিকে তাকান; হাজি মুরাদও তাকায় তার দিকে।

উভয়ের চোখোচোখি হয়। এই দৃষ্টি বিনিময়ে এমন কথা বলা হয় যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দোভাষী যে কথা শোনাল তার সঙ্গেও একথার কোন সম্পর্ক সেই। বিনা বাক্যব্যয়ে উভয়েই আদত কথা বলে। ভরন্তসভের দৃষ্টি বলে যে, হাজি মুরাদের কথার এক বর্ণও তিনি বিশ্বাস করেননি এবং তিনি জানেন যে বরাবরই সে রুশদের সব কিছুর শত্রু, শুধু বাধ্য হয়েই তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। হাজি মুরাদও এটা বুঝতে পারে; তবু সে নিজের

বিশ্বস্ততার আশ্বাস দেয়। তার চোখ বলে, যুদ্ধের কথা না ভেবে বৃদ্ধ নিজের মৃত্যুর কথা ভাবছে। তবু বৃদ্ধ হলেও লোকটা চতুর। আমাকে হুঁশিয়ার হতে হবে। ভরন্তসভও এ মনোভাব বুঝতে পারেন; তবু যুদ্ধের সাফল্যের কথা বিবেচনা করে তিনি হাজি মুরাদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, ওকে বল যে আমাদের রাজা যেমন শক্তিমান তেমনি দয়ালু; সম্ভবতঃ আমার অনুরোধে ওকে ক্ষমা করে চাকুরিতে নেবেন। বলেছ? তারপর তিনি হাজি মুরাদের দিকে তাকান, প্রভুর মহান নির্দেশ যতক্ষণ না পাচ্ছি, ওকে বল, এখানে থাকবার কোন অসুবিধা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা আমি করব।

হাজি মুরাদ তখন আরার বুকে হাত দেয় এবং সোৎসাহে আর কি যেন বলতে শুরু করে। দোভাষী তর্জমা করে বলে, বলছে যে ১৮৩৯ সালে যখন সে আভেরিয়ার নায়েব ছিল, তখন বিশ্বস্তভাবেই রুশদের সেবা করেছে এবং কিছুতেই সে রুশপক্ষ ছেড়ে যেত না যদি তার দুশমন আকমত খাঁ তাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে জেনারেল ক্লুগেনাউর কাছে তার কুৎসা না করত।

ভরন্তসভ বলেন, জানি, জানি! কোনদিন একথা জানলেও তিনি বহুপূর্বেই তা ভুলে গেছেন। চেয়ারে বসে তিনি হাজি মুরাদকে দেয়ালের পাশে ডিভানে বসবার ইঙ্গিত করেন। কিন্তু হাজি মুরাদ বসল না। শক্তিশালী কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে

সে বোঝাতে চাইল যে এমন এক মান্যগন্য লোকের সামনে সে বসতে পারে না। তারপর দোভাষীকে লক্ষ্য করে বলে, আকমত খাঁ এবং শামিল উভয়েই আমার শত্রু। আকমত খাঁ মারা গেছে, কাজেই তার উপর শোধ তোলা যাবে না। কিন্তু শামিল বেঁচে আছে, তার উপর প্রতিশোধ না নিয়ে আমি মরব না। ভ্রূকুঞ্চিত করে সে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে।

বুঝলাম, কিন্তু কি ভাব ও প্রতিশোধ নিতে চায়? ভরন্তসভ শান্তভাবে দোভাষীর কাছে বলেন।—বল, ও বসতে পারে।

আবারও বসতে অস্বীকার করে হাজি মুরাদ এবং জিজ্ঞাসার জবাবে জানায় যে শামিলকে ধ্বংস করার জন্যই সে রুশপক্ষে এসেছে।

ভরন্তসভ বলেন, তা ভাল, তা ভাল! কিন্তু আসলে কি করতে চায়? বস, বস!

হাজি মুরাদ বসে এবং বলে যে তাকে একবার যদি লেশ-ঘিয়ান ব্যূহে পাঠিয়ে একটা সৈন্যদল দেওয়া হয়ত তো গোটা দাগেস্তানকে সে বিদ্রোহী করে তুলতে পারবে! তখন শামিল আর কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারবে না।

প্রস্তাবটা চমৎকার···আমি ভেবে দেখব। ভরন্তসভ বলেন।

দোভাষী ভরন্তসভের কথা তর্জমা করে শোনায়। হাজি মুরাদ চিন্তা করে। একটু বাদেই আবার বলে, আর একটা কথা সর্দারকে বলুন। আমার পরিবার দুশমনদের হাতে। যতদিন তারা পাহাড়ে থাকবে, আমার হাত পা বাঁধা। ওঁর সেবা করা

আমার সাধ্যাতীত। প্রকাশ্য বিরুদ্ধতা করলে শামিল আমার স্ত্রী, মা এবং সন্তানসন্ততিকে হত্যা করবে। প্রিন্স প্রথমে আমার পরিবারকে বন্দীদের সঙ্গে বদল করে নিয়ে আসুন। তারপর আমি শামিলকে ধ্বংস করব, নয় মরব।

ঠিক আছে! ভেবে দেখব। ভরন্তসভ বলেন।—হাঁ, এখন চীফ অফ স্টাফের কাছে নিয়ে যাও এবং ওর মর্যাদা, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের কথা তাকে বুঝিয়ে বল!

এই ভাবেই হাজি মুরাদ ও ভরন্তসভের প্রথম সাক্ষাৎ শেষ হয়।

প্রাচ্য কায়দায় সাজান নতুন থিয়েটারে সেদিন এক ইতালীয় অপেরা অভিনীত হয়। ভরন্তসভ বক্সে বসেছিলেন। পাগড়ি পরা খোঁড়া হাজি মুরাদের আকর্ষণীয় চেহারা এই সময় প্রেক্ষাগৃহে দেখা দেয়। ভরন্তসভের সহচর লোরিশ মেলিকভের সঙ্গে এসেছে। তার তদারকিতেই আছে হাজি মুরাদ। সামনের এক আসনে তারা বসে। প্রাচ্যের মুসলমানদের মত নির্লিপ্তভাবে বসে সে প্রথম অঙ্ক দেখে। মুখে আনন্দের লেশমাত্র নেই; বরং আছে সুস্পষ্ট ঔদাসীন্য। সহসা উঠে দাঁড়িয়ে সে শান্তভাবে দর্শকদের দিকে চোখ বুলোয় এবং সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পরদিন সোমবার। ভরন্তসভ ভবনে সেদিন যথারীতি সান্ধ্য মজলিস বসে। উজ্জ্বল আলোকদীপ্ত প্রকাণ্ড হলঘরের এক প্রান্তে গাছের আড়ালে ব্যাণ্ড বাজছে। তরুণী এবং যারা তরুণী নয় তারাও বাহু কাঁধ ও বুক খোলা বেশবাসে সজ্জিত

হয়ে জমকাল উর্দিপরা পুরুষের আলিঙ্গনে বার বার পাক খেয়ে ঘুরছে। খাবার জায়গায় হাঁটু অবধি ব্রিচেজ, বুট এবং চাতকের লেজের মত লাল কোটপরা পরিচারকরা শাম্পেন ঢালছে এবং মিঠাই দিচ্ছে মহিলাদের। সর্দারের বর্ষিয়সী স্ত্রীও অর্ধনগ্ন বেশবাসে মিঠে হাসিভরা মুখে অতিথিদের মধ্যে ঘোরাফিরা করছেন। দোভাষীর মারফত হাজি মুরাদের সঙ্গেও তিনি গুটিকয়েক মিঠে কথা বলে যান। কাল রাত্রে থিয়েটারে যেমন উদাসভাবে হাজি মুরাদ দর্শকদের দিকে চেয়েছিল, আজও তেমনি নির্লিপ্তভাবেই দেখছে। গৃহকর্ত্রীর পর অন্যান্য অর্ধনগ্ন মহিলারা হাজি মুরাদের কাছে আসে এবং সমান নির্লজ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে একই কথা জিজ্ঞাসা করেঃ কেমন লাগছে? সোনার এপলেট, সোনার তাজ এবং গলায় ঝুলান সাদা ক্রশ ও ফিতে পরা ভরন্তসভও এসে একই কথা জিজ্ঞাসা করেন। আর সকলের মত তারও দৃঢ় বিশ্বাস যে হাজি মুরাদ যা দেখছে তাতে খুশি না হয়ে পারে না। আর সবাইকে যে জবাব দিয়েছে, ভরন্তসভকেও সে একই জবাব দেয়। ভালমন্দ কোন মন্তব্যই করল না। শুধু জানাল যে তাদের জাতের মধ্যে এমন কোন অনুষ্ঠান নেই।

এই বল-নাচের আসরেই হাজি মুরাদ আবার ভরন্তসভের কাছে তার পরিবার ফিরিয়ে আনার কথা তোলে। না শুনবার ভান করে ভরন্তসভ অন্যত্র চলে যান। লোরিশ-মেলিকভ পরে হাজি মুরাদকে বলে যে কাজের কথা বলার সময় এটা নয়।

এগারটা বাজলে হাজি মুরাদ লোরিস-মেলিকভকে জিজ্ঞাসা করে যে সে এখন যেতে পারে কি না। ভরন্তসভের দেওয়া ঘড়ি দেখে সে ঠিকমত সময় ঠিক করতে পারছে। লোরিস-মেলিকভ বলে যে যেতে বাধা নেই, তবে না গেলেই ভাল হয়। এ সত্ত্বেও হাজি মুরাদ অপেক্ষা করল না। যে ফিটনখানা তাকে দেওয়া হয়েছে তাতে করেই সে বাসায় ফিরে আসে।

তিফলিসে অবস্থানের পঞ্চম দিবসে রাজপ্রতিনিধির পার্শ্বচর লোরিস-মেলিকভ তার আদেশে হাজি মুরাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে।

মাথা হেঁট করে বুকে হাত দিয়ে হাজি মুরাদ স্বাভাবিক কূটনৈতিক ভাষায় জানায়, 'সর্দারের সেবা করবার সুযোগ পেলে আমার শির ও হাত ধন্য হবে। লোরিস-মেলিকভের মুখের দিকে চেয়ে অমায়িক ভাবে বলে, হুকুম করুন!

লোরিস-মেলিকভ টেবিলের পাশে আর্মচেয়ারে বসে পড়ে। হাজি মুরাদ বসে তার মুখোমুখি নীচু ডিভানে। হাঁটুর উপর হাত রেখে মাথা নীচুকরে নিবিষ্টমনে সে লোরিস মেলিকভের কথা শোনে।

তাতার ভাষা অনর্গল বলতে পারে লোরিস মেলিকভ। সে বলে, প্রিন্স তার অতীত জীবনের সব কথা জানলেও, তার নিজের মুখ থেকেই গোটা কাহিনী শুনতে চান।

আমাকে বলুন! লিখে নিয়ে আমি রুশভাষায় তর্জমা করে দেব; তারপর প্রিন্স সেটা সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

হাজি মুরাদ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। অবিশ্যি অপরের কথায় বাধা দেওয়া তার স্বভাব নয়। বরাবর সে অন্যের কথা শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করে। একটু বাদে মাথা তুলে সে টুপিটা পেছনে ঠেলে দেয় এবং যে হাসি মারিয়া ভাসিলেভনাকে মুগ্ধ করেছে আবার সেই শিশুসুলভ অমায়িক হাসি হাসে।

সম্রাটের কাছে তার জীবন কাহিনী পাঠান হবে এই সংবাদে খানিকটা উৎসাহিত হয়ে বলে, তা বলতে পারি।

পকেট থেকে নোট-বই বার করে লোরিস-মেলিকভ বলে, আপনাকে বলতেই হবে। (তাতার ভাষায় তুমি সম্ভাষণ নেই)। সব কিছু প্রথম থেকে পর পর বলে যান।

তা পারি—কিন্তু তাতে অনেক কথাই যে বলতে হয়! অনেক ঘটনাই ঘটেছে! হাজি মুরাদ বলে।

লোরিস মেলিকভ তখন বলে, একদিনে শেষ করতে না পারেন তো আর একদিন বলবেন!

প্রথম থেকেই শুরু করব?

হাঁ প্রথম থেকেই! কোথায় জন্মেছিলেন…কোথায় থাকতেন।

আবার মাথা হেঁট করে হাজি মুরাদ। অনেকক্ষণ বসে থাকে সেই ভাবে। তারপর ডিভানের উপর থেকে এক খানা ছড়ি তুলে নিয়ে সে ছোরার তলা থেকে হাতির দাঁতের বাঁটের উপর সোনার কাজ করা এক খানা ছোট্ট ছুরি টেনে বার করে। ছুরি দিয়ে ছড়ি খানা কাটতে কাটতে সে বলতে শুরু করে ঃ

লিখুন, তসেলমেস গ্রামে জন্মেছি। ছোট্ট আউল। পাহাড়েদের ভাষায় গাধার মুণ্ডের মত। খুনজাখ এখান থেকে খুব দূরে নয়—বড়জোর দুটো তোপের পাল্লা। খাঁ রা বাস করত সেখানে। তাদের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

আমার বড় ভাই ওসমানের জন্মের পর আমার মা জ্যেষ্ঠ খাঁ আবু নুতসল খাঁকে লালনপালন করেন। তারপর খাঁর মেজছেলে উম্মাখাঁকেও মা পালন করেন। কিন্তু আমার মেজ ভাই আখমত মারা যায়। আমি যখন জন্মালাম এবং খানশা (খাঁর স্ত্রী) বুলাচ খাঁকে প্রসব করেন, মা ধাত্রী হিসাবে যেতে রাজী হলেন না। বাবা তাকে যেতে বললেন কিন্তু তিনি আপত্তি করেন। বলেন, তাহলে আবারও আমার নিজের পেটের ছেলে মারা যাবে—আমি যাব না। বাবা বদ মেজাজি ছিলেন। এই কথা শুনে তিনি মাকে ছোরা দিয়ে কোপ দেন এবং লোকজন এসে না থামালে হয়ত মেরেই ফেলতেন। কাজেই তিনি আমায় ছেড়ে গেলেন না। পরে এ নিয়ে তিনি একটা গান রচেন···সে কথা না হয় নাই বল্লাম।

হাঁ, সব কিছুই বলতে হবে। দরকার আছে। লোরিস-মেলেকভ বলে।

হাজি মুরাদ আবার চিন্তামগ্ন হয়। মনে পড়ে মা তাকে কেমন করে ফারকোট চাপা দিয়ে সাকলার চালে তাঁর পাশে তাকে ঘুম পাড়াতেন। আর হাজি মুরাদ তাঁকে বুকের উপর কাটা দাগটা দেখাতে বলত।

গানটা মনে আছে। সে আবৃত্তি করে যায় ঃ

"চকচকে ইস্পাতের ফলায় আমার সাদা বুক বিদ্ধ,
তাঁর উপরেই শুইয়েছি আমার সূর্য, আমার প্রিয় ছেলেকে—
আমারই বুকের খুনে নেয়ে গেছে তার সারা দেহ।
লতাপাতা ছাড়াই সেরে যায় আমার ক্ষত।
মরণের ভয় করিনি—আমার ছেলেও করবে না কোনদিন।"

সে বলে, আমার মা এখন শামিলের হাতে। তাঁকে উদ্ধার করতেই হবে।

তারপর মনে পড়ে পাহাড়ের নীচে ঝর্ণার কথা। মা জল আনতে যাবার সময় তাঁর শারোভারি (ঢিলে তুর্কী পাজমা) ধরে সেও সঙ্গে যেত। মনে পড়ে প্রথমবার মাথা কামিয়ে দেবার কথা। দেয়ালে ঝুলান চকচকে পিতলের কলসীতে নিজের গোল নীলচে নেড়া মাথায় প্রতিচ্ছবি দেখে সে অবাক হয়ে যেত। যে শীর্ণ কুকুরটা একবার মুখ চেটে দিয়েছিল তার কথাও মনে হয়! মনে জাগে মায়ের দেওয়া লেপেশ্‌কির (চ্যাপটা এক রকম পিঠে) অদ্ভুত খোশবায়, ধোঁয়া আর টক দইর গন্ধ। পিতামহের সঙ্গে গোলা বাড়িতে দেখা করার জন্য একবার মা তাকে ঝুড়িতে ভরে পিঠে বয়ে নিয়ে যান ; সে কথাও আজ মনে হয়। মনে পড়ে, পিতামহের পাকা চুল আর ভাঁজপরা মুখ···শিরাল হাতে কেমন করেই বা তিনি রূপো পিটতেন।

তারপর মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বলে, হাঁ, কাজেই মা আর ধাত্রী হিসাবে গেলেন না! খানশা আর এক ধাত্রী রাখেন, তবু মায়ের

উপর তার টান ছিল। মা আমাদের খানশার প্রসাদে নিয়ে যেতেন···আমরা তার ছেলেদের সঙ্গে খেলাধূলা করতাম··· তিনিও ভালবাসতেন আমাদের।

তিনজন ছোট খাঁ ছিল : আমার দাদা ওসমানের পাতানো ভাই আবু নুতসল খাঁ; আমার পাতান-ভাই উম্মা খাঁ আর কনিষ্ঠ বুলাচ খাঁ। শামিল তাকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সে পরের কথা।

আমার ষোল বছর বয়সে মুরিদরা আউলে আসতে আরম্ভ করে। কাঠের বাঁকা তরোয়াল দিয়ে পাথরের উপর পিটে চীৎকার করে বলত, মুসলমান, গাজাভাত! চিচেনরা মুরিদদের দলে যায়; আভররাও যেতে শুরু করে। আমি খাঁদের ভাইয়ের মত প্রাসাদে বাস করছি। যা খুশি করতে পারি। বেশ ধনীও হলাম। ঘোড়া, হাতি আর অর্থ সবই আমার ছিল। তখন শুধু আরাম খুঁজে বেড়াতাম—কোন চিন্তা ভাবনা ছিল না। ইমাম কাজি মোল্লা নিহত না হওয়া অবধি এই ভাবেই চলে। তারপর হামজাদ ইমাম হয়। ইমাম হয়েই দূত মারফত খাঁদের কাছে বলে পাঠায় যে তারা যদি গাজাভাতে যোগ না দেয় তো গোটা খুনজাখ ধ্বংস করে দেবে।

ব্যাপারটা বিশেষ ভাবে চিন্তা করা দরকার হয়ে পড়ে। রুশদের ভয় করে খাঁরা; আবার ধর্ম-যুদ্ধে যোগ দিতেও তারা ভয় পায়। বুড়ো খানশা তখন তার মেজ ছেলে উম্মা খাঁ আর আমাকে তিফলিসে পাঠান এবং হামজাদের বিরুদ্ধে রুশ প্রধান

সেনাপতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। ব্যারন রোজেন তখন তিফলিসে প্রধান সেনাপতি। উম্মা খাঁ বা আমি কারও সঙ্গেই তিনি দেখা করলেন না। বলে পাঠালেন যে সাহায্য করবেন কিন্তু কিছুই করলেন না। শুধু তার অফিসাররা ঘোড়ায় চড়ে এসে উম্মা খাঁর সঙ্গে তাস খেলত। তাকে এরা মদ খাইয়ে মাতাল করে এবং কু-স্থানে নিয়ে যায়। তাস খেলায় সে সব কিছু হেরে যায়। ষাঁড়ের মত জোর তার গায়ে আর সাহস ছিল সিংহের মত; কিন্তু প্রাণটা তার জলের মত দুর্বল। আমি যদি তাকে ফিরিয়ে না আনতাম তো শেষ ঘোড়া এবং হাতিটি পর্যন্ত সে জুয়ায় হেরে বসে থাকত। তিফলিসে এসে আমার ধারণা বদলে যায়। ফিরে গিয়ে আমি বৃদ্ধা খানশা ও খাঁদের গাজাভাতে যোগ দিতে পরামর্শ দি…

লোরিস মেলিকভ জিজ্ঞাসা করে, কেন আপনি মত পরিবর্তন করলেন? রুশদের উপর কি খুশি হতে পারেন নি?

হাজি মুরাদ একটু হাসে। তারপর চোখ বুজে সরাসরি বলে বসে, না পারিনি। তাছাড়া আর এক কারণেও আমি গাজাভাতে যোগ দিতে চেয়েছিলাম।

কি সে কারণ?

তসেলমেস গ্রামের কাছাকাছি জন তিনেক মুরিদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। দু'জন পালিয়ে যায়; কিন্তু আর এক জনকে আমি পিস্তলের গুলিতে খুন করি। যখন তার হাতিয়ার আনতে গেলাম, তখনও লোকটা বেঁচে। আমার দিকে চেয়ে

সে বলে, আপনি আমায় খুন করলেন....আমি সুখী। কিন্তু মুসলমান আপনি, শক্তি ও বয়স দুই-ই আছে, গাজাভাতে যোগ দিন। খোদার তাই ইচ্ছে।

আপনি যোগ দিয়েছিলেন?

না দেইনি। কিন্তু কথাটা আমায় ভাবিয়ে তোলে। হাজি মুরাদ বলে। তারপর আবার কাহিনী বলে যায়:

হামজাদ খুনজাখের কাছাকাছি এলে আমরা প্রবীনদের পাঠিয়ে জানাই যে ইমাম যদি একজন আলিম পাঠিয়ে ব্যাপারটা আমাদের বুঝিয়ে দেন তো আমরা গাজাভাতে যোগ দিতে পারি। হামজাদ আমাদের চারজন প্রবীনের গোঁফ কামিয়ে নাক ফুটো করে পিঠে ঝুলিয়ে দেয় এবং সেই ভাবেই তাদের ফেরত পাঠায়।

প্রবীনরা সংবাদ নিয়ে আসেন যে খানশা যদি তার ছোট ছেলেকে প্রতিভূ হিসাবে পাঠাতে রাজী হন তো গাজাভাতের তাৎপর্য বোঝাবার জন্য হামজাদ একজন শেখ পাঠাতে পারে। খানশা তার কথায় বিশ্বাস করে ছোট ছেলে বালুচ খাঁকে পাঠান। হামজাদ সাদরে তাকে সম্বর্দ্ধনা করে এবং আরও দুই ভাইকে নিমন্ত্রণ করে পাঠায়। সে বলে পাঠায় যে তার বাপ যেমন এদের বাপের সেবা করেছে, সেও তেমনি খাঁ পরিবারের সেবা করতে চায়। খানশা দুর্বল প্রকৃতির নির্বোধ অথচ অহঙ্কারী স্ত্রীলোক ছিলেন। অবিশ্যি অভিভাবকহীন সব স্ত্রীলোকই অমনি হয়। দুই ছেলেকে পাঠাতে তার ভরসা হল না।

পাঠালেন শুধু উম্মা খাঁকে। আমি গেলাম সঙ্গে। আমরা পৌঁছোবার মাইল খানেক আগেই মুরিদরা আমাদের সংবর্ধনা করে। গান গেয়ে গুলি ছুঁড়ে আমাদের চারপাশে তারা আনন্দ করে। কাছাকাছি আসতেই হামজাদ তাঁবু থেকে বেরিয়ে উম্মা খাঁর রেকাব ধরে এবং খাঁর মত তার সংবর্ধনা করে। সে বলে, আপনাদের পরিবারের কোন অনিষ্ট আমি করিনি— করবার ইচ্ছাও নেই। আমায় খুন করবেন না ; আর জনতাকে গাজাভাতে নিয়ে যেতেও বাধা দেন না যেন। তাহালে আমার বাবা যেমন আপনার বাবার সেবা করেছেন, আমি গোটা ফৌজ নিয়ে আপনার সেবা করব। আমাকে আপনাদের বাড়ীতে থাকতে দিন। পরামর্শ দিয়ে আমি আপনাদের সাহায্য করব ; আর আপনারা যা খুশি করতে পারবেন।

কথাবার্তায় উম্মা খাঁ তেমন চটপটে ছিল না। ঠিক করে উঠতে পারছিলনা কি বলবে। চুপ করে থাকে। আমি তখন বল্লাম, তাই যদি হয় তো হামজাদ খুনজাখে চলুন, খাঁরা সসম্মানে তাকে সংবর্ধনা করবেন। কিন্তু কথাটা শেষ করবার আগেই শামিল বলে ওঠে, আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি···খাঁ জবাব দিন! ইমামের পাশেই দাঁড়ান ছিল শামিল। সেই তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

আমি চুপ করে গেলাম। হামজাদ উম্মাকে তার তাঁবুতে নিয়ে যায়। পরে হামজাদ আমার ডেকে পাঠায় এবং তার দূতের সঙ্গে খুনজাখে ফিরে যাবার হুকুম করে। বড় ছেলেকেও

হামজাদের কাছে পাঠাতে খানশাকে রাজী করাতে চেষ্টা করে দূত। বুঝলাম এর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্ত আছে। বড় ছেলেকে না পাঠাতে বল্লাম খানশাকে। কিন্তু ডিমের গায়ে যত লোম আছে, মেয়েলোকের মগজে বুদ্ধিও ততটুকু। ছেলেকে তিনি যাবার হুকুম করেন। আবু নুতসল খাঁর ইচ্ছা ছিলনা। খানশা তখন বলেন, বুঝলাম, ভয় পেয়েছিস! কোথায় হুল ফুটালে বেশী লাগে, মৌমাছির মত তা তাঁর ভালই জানা ছিল। আবু নুতসল খাঁর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। মায়ের সঙ্গে কথা না বলে সে ঘোড়ায় জিন লাগাবার হুকুম দেয়। আমি তার সঙ্গী হলাম।

উম্মা খাঁকে যতটা সমাদর দেখিয়েছে, তার চাইতে বেশী সামাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করে হামজাদ। আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য সে পাহাড় থেকে ছুটো রাইফেলের গুলির পাল্লা অবধি এগিয়ে আসে। পতাকাসহ ঘোড়সওয়ারের একটি মস্ত মিছিল আমাদের অনুগমন করে। তারা গান গায়, গুলি ছোঁড়ে এবং নানাভাবে আমোদ-প্রমোদ করে।

তাঁবুতে পৌছাবার পর খাঁকে হামজাদ নিজের তাঁবুতে নিয়ে যায়। আমি ঘোড়ার কাছে রইলাম……

পাহাড়ের খানিকটা নীচু থেকে সহসা হামজাদের তাঁবুতে গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। অমনিই ছুটে গেলাম। দেখি, উম্মা খাঁ রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছে আর আবু নুতসল লড়াই করছেন মুরিদদের সঙ্গে। তার একটা গাল কেটে

গেছে—ঝুলছে ঝুল ঝুল করে। একহাতে তিনি গাল চেপে আছেন আর অপর হাতে ছোরা নিয়ে যে কাছে আসছে তাকেই কোপাচ্ছেন। দেখলাম, হামজাদের ভাইকে তিনি ছোরা মারলেন! তার পর আর একজনের দিকে যেই তাক করলেন, অমনিই একটা গুলি এসে লাগে। তিনি পড়ে যান।

হাজি মুরাদ থামে। রোদে-পোড়া কালচে মুখখানা এই সময় রাঙা হয়ে উঠে। চোখ দুটো হয় লাল টকটকে।

বেদম ভয় হল আমার। পালিয়ে এলাম।

সত্যি ? আমার ধারণা কোনদিন আপনি ভয় পাননি।

লোরিস মেলিকভ বলে।

তার পর আর কোনদিন পাইনি। তারপর থেকে বরাবর সেই লজ্জার কথা মনে রেখেছি। যখনই মনে হয়েছে, ভয় পালিয়ে গেছে।

অনেক হল। নমাজের সময় হয়েছে! হাজি মুরাদ বলে। সিরকাজীয় কুর্তাব ভেতরের বুক পকেট থেকে ভরন্তসভের দেওয়া ঘড়ি বার করে সে সময় দেখে। সযত্নে চাবিতে চাপ দিতেই সওয়া বারটা বাজে। শিশুসুলভ কৌতূহলী হাসি দমন করে হাজি মুরাদ ঘাড় কাত করে শোনে। হেসে বলে, কুনাক ভরন্তসভ দিয়েছেন!

লোরিস মেলিকভ বলে, বেশ তাহলে যান, নমাজ পড়ে আসুন। আমি অপেক্ষা করছি।

ইয়কশি! বেশ! হাজি মুরাদ শোবার ঘরে চলে যায়।

লোরিস মেলিকভ এই সুযোগে হাজি মুরাদের কাহিনীর প্রধান প্রধান ঘটনা কটি নোট বইয়ে টুকে নেয়। তারপর সিগ্রেট ধরিয়ে পায়চারি করতে থাকে। শোবার ঘরের বিপরীত দিকের দরজায় এসে তাতার ভাষার অনর্গল উত্তেজিত আলোচনা তার কানে আসে। বুঝতে পারে, হাজি মুরাদের মুরিদরা আলোচনা করছে। দরজা খুলে সে ভেতরে যায়।

পাহাড়েদের গায়ের বিদঘুটে চামসে টকো গন্ধে ভুর ভুর করছে ঘরখানা। মেজেয় বোরকা ছড়িয়ে শতছিন্ন তেলচিটে বেশমেতপরা কানা লালচুল গামজালো বসে একটা লাগাম ভাঁজ করছে। ধেড়ে গলায় উত্তেজিত ভাবে কি যেন সে বলছিল ; কিন্তু লোরিস মেলিকভ ঘরে ঢুকতেই চুপ করে সে হাতের কাজ করে যায়।

খান মহমা সাদা দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে আছে গামজালোর সামনে। চকচক করছে পক্ষহীন চোখ দুটো। বার বার কি যেন সে বলছে। আস্তিন গুটিয়ে সুদর্শন এলদার পেরেকের সঙ্গে জিন ঝুলিয়ে পালিশ করছে। সংসারের কর্তা এবং মুখ্য কর্ম্মচারী খানেফি তখন ঘরে সেই। রান্নাঘরে রান্না করছে।

লোরিস মেলিকভ তাদের সম্ভাষণ জানিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি নিয়ে তর্ক করছিলে ?

লোরিস মেলিকভের দিকে হাত বাড়িয়ে খান মহমা বলে, দেখুন না, ও শামিলের প্রশংসা করছে। বলছে শামিল নাকি মস্ত বড় লোক—জ্ঞানী এবং দজিগিত।

তার পক্ষ ছেড়ে এসেও তাকে প্রশংসা করছে কেন?

দেখুন না, তার পক্ষ ছেড়েও প্রশংসা করছে! ফিক করে হেসে আনন্দদীপ্ত চোখে বলে খান মহমা।

লোরিস মেলিকভ জিজ্ঞাসা করে, ও কি সত্যিই তাকে সাধু বলে মনে করে?

সাধু না হলে লোক তার কথা শুনত না। বড়বড় করে বলে গামজালো।

খান মহমা বলে, শামিল সাধু নয়, কিন্তু মনসুর সাধু ছিল। সত্যই সাধু ছিল সে। সে যখন ইমাম ছিল, লোকের অবস্থা ছিল অন্যরকম। প্রায়ই সে ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত আর লোকে এসে তার কোটের প্রান্তে চুমু খেয়ে সমস্ত পাপ স্বীকার করত—শপথ করত আর কখনও অন্যায় করবে না বলে। বুড়োরা বলেন, সব লোক তখন সাধুর মত বসবার করত। কেউ মদ খেত না, ধূমপান করত না, নমাজেও অবহেলা করত না। রক্তপাত হয়ে গেলেও মানুষ পরস্পরের অপরাধ ক্ষমা করত। কেউ যদি অর্থ কুড়িয়ে পেত তো পুঁটলি করে দড়িতে বেঁধে রাস্তার পাশে ঝুলিয়ে রাখত। সে সময় ভগবান মানুষকে সব বিষয়ে সাফল্য দিতেন—আজকের মত অবস্থা ছিল না।

গামজালো বলে, পাহাড়ে এখনও কেউ মদ বা তামাক খায় না।

লোরিস মেলিকভের দিকে চেয়ে চোখে টিপ মেরে খান মহমা বলে, তোমার শামিল আস্ত এক লামোরে। (পাহাড়েদের পক্ষে লামোরে ঘৃণাসূচক শব্দ)।

বেশ তো, লামোরে অর্থ পাহাড়ে। গামজালো জবাব দেয়।—আর এই পাহাড়েই ঈগলের বাসা।

চালাক বটে! বেশ বলেছে! প্রতিপক্ষের জবাবে তুষ্ট হয়ে হেসে বলে খান মহমা।

লোরিস মেলিকভের হাতে রূপোর সিগ্রেটের কৌটো দেখে খান মহমা একটা সিগ্রেট চায়। কিন্তু লোরিস মেলিকভ যেই বলে যে ধূমপান তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ, এক চোখে টিপ মেরে মাথা ঝঁকানি দিযে হাজি মুরাদের দরজা দেখিয়ে সে বলে, আড়ালে খেলে দোষ নেই—না দেখলেই হল। সঙ্গে সঙ্গে সে সিগ্রেট টানতে শুরু করে। ধোঁয়া গিলছে না। বিচ্ছিরি ভাবে ঠোঁট ফুলিয়ে ফু-করে ধোঁয়া ছাড়ছে।

এ অন্যায়! গম্ভীর ভাবে গামজালো বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

খান মহমা তার দিকে চেয়ে চোখে টিপ মারে এবং লোরিস মেলিকভকে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় গেলে সব চাইতে ভাল বেশমেত আর সদা টুপি কেনা যায়।

কেন, তোমার কি এত অর্থ আছে নাকি?

ঢের ঢের আছে। আবার চোখে টিপ মেরে বলে খান মহমা।

লোরিস মেলিকভের দিকে সুদর্শন সহাস মুখ ফিরিয়ে এলদার বলে, জিজ্ঞাসা করুন না এত অর্থ কোথায় পেল?

কেন, জিতেছি! চট করে বলে ওঠে খান মহমা। তারপর শোনায় কেমন করে জিতেছে: আগের দিন তিফলিসের পথে

পথে ঘুরবার সময় একদল রুশ ও আর্মানির সঙ্গে দেখা হয়। অরলাংকা (এক ধরণের জুয়া) খেলছিল তারা। বাজি অনেক—তিনটে স্বর্ণ মুদ্রা এবং বহু রৌপ্য মুদ্রা। খান মহমা চটপট খেলাটা বুঝে নেয় এবং নিজের পকেটের তাম্রমুদ্রায় ঝনঝন শব্দ করে খেলোয়ারদের কাছে গিয়ে বলে যে সে সমস্ত অর্থ বাজি রাখবে!

লোরিস মেলিকভ বলে, কোন ভরসায় করলে? অত অর্থ ছিল তোমার?

মাত্র বার কোপেক ছিল! ফিক করে হেসে খান মহমা বলে।

যদি হেরে যেতে?

কেন, এইটে রয়েছে তো! পিস্তলটা দেখিয়ে বলে খান মহমা।

দিয়ে দিতে পিস্তলটা?

তা আর দিতাম না! আমি তখন দৌড় দিতাম; কেউ থামাবার চেষ্টা করলে খুন করে ফেলতাম—ব্যস!

হাঁ তারপর? জিতলে তো?

জিতলাম না আবার! সবটা জিতে নিয়ে চলে এলাম!

লোরিস মেলিকভ তখন বুঝতে পারে, কি ধরণের মানুষ এই খান মহমা আর এলদার। দিল দরিয়া লোক খান মহমা। কোন চিন্তা ভাবনার বালাই নেই। মজার একটা কিছু পেলেই আর কথা নেই! উচ্ছল জীবনীশক্তি নিয়ে কি যে করবে লোকটা

ঠাহর করে উঠতে পারছে না। সব সময় সে হাসিখুশি বেপরোয়া। অনবরত খেলছে নিজের ও অপরের জীবন নিয়ে। জীবন নিয়ে খেলবার নেশায় আজ সে রুশ পক্ষে এসেছে; আবার এই নেশাই একদিন হয়ত তাকে শামিলের কাছে নিয়ে যাবে!

এলদারকে চেনাও খুব সহজ! বীর বলবান দৃঢ়চরিত্রের মানুষ সে। গোটা জীবন মুরশেদের (১) সেবার উৎসগীত।

একমাত্র লালচুল গামজালো লোকটাকেই লোরিস মেলিকভ বুঝতে পারল না। লোকটা শুধু শামিলের অনুগতই নয়—রুশদের সব কিছুর প্রতি তার এক দুরতিক্রম্য ঘৃণা, বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা ও বিরক্তি আছে। লোরিস মেলিকভ বুঝতে পারল না লোকটা কেন এপক্ষে এসেছে। তার মনে হল, হাজি মুরাদের আত্মসমর্পণ এবং শামিলের প্রতি তার ঘৃণার কাহিনী মিথ্যা। উপরতলার জন কয়েক অফিসার ইতিমধ্যেই এ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। হাজি মুরাদ আত্মসমর্পণ করেছে হয়ত রুশ পক্ষের দুর্বল স্থানের খোঁজ খবর নেবার জন্য। তারপর আবার পালিয়ে গিয়ে হয়ত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সৈন্য চালনা করবে। গামজালো লোকটার হাবভাব এই সন্দেহ দৃঢ় করে।

লোরিস মেলিকভ ভাবে, আর সবাই এমন কি হাজি মুরাদ নিজেও জানে কেমন করে মনোভাব গোপন রাখতে হবে; আর এই লোকটা প্রকাশ্য ঘৃণা দেখিয়ে তাদের ফন্দী ফাঁস করে দিচ্ছে!

(১) মুরশেদ : সুফিবাদের সমধর্মী মুরিদবাদের পথ প্রদর্শক।

গামজালোর সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করে লোরিস মেলিকভ। জিজ্ঞাসা করে, তার বিচ্ছিরি লাগছে কি না। হাতের কাজ না থামিয়ে তেরচা চোখে প্রশ্নকর্তার দিকে চেয়ে খেড়ে গলায় বলে, না! লোরিস মেলিকভের অন্যান্য প্রশ্নের জবাবও সে এমনি ভাবেই দেয়।

লোরিস মেলিকভ ঘরে থাকতেই হাজি মুরাদের চতুর্থ মুরিদ আভর খানেফি আসে। মুখ কাঁধ লোমেভরা। বাঁকা বক্ষঃস্থল মনে হয় যেন শ্যাওলাভরা। বলবান ও কঠোর পরিশ্রমী খানেফি। সব সময় নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। এলদারের মতই সে মালিকের একান্ত অনুগত।

চাল নেবার জন্য যখন সে ঘরে ঢোকে, লোরিস মেলিকভ তাকে থামায়। জিজ্ঞাসা করে কোথায় তার বাড়ী, আর কত দিনই বা হাজি মুরাদের সঙ্গে আছে।

খানেফি বলে, পাঁচ বছর। তার আউলেই আমার বাড়ী। আমার বাবা ওর খুড়োকে খুন করে, উনিও আমাকে খুন করতে চান! জোড়া ভুরুর তলায় শান্ত দৃষ্টিতে সরাসরি লোরিস মেলিকভের দিকে চেয়ে সে বলে যায়, তখন আমি ওকে আমায় ভাই বলে গ্রহণ করতে অনুরোধ করি।

ভাই বলে গ্রহণ করতে বলার অর্থ কি?

ছ মাস আমি মাথা কামাইনি কিম্বা নখ কাটিনি। তারপব ওর কাছে আসি। তখন ওরা আমাকে ওদের মা পানিমতের

কাছে নিয়ে যান। তিনি আমাকে স্তন্যপান করান। এরপর আমি ওদের ভাই হই।

পাশের ঘর থেকে এই সময় হাজি মুরাদের ডাক শোনা যায়। এলদার সাড়া দেয় এবং হাত মুছে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যায়।

ফিরে এসে বলে, আপনাকে যেতে বলেছেন।

দিলদরিয়া খান মহমাকে আর একটা সিগ্রেট দিয়ে লোরিস মেলিকভ ড্রয়িং রুমে চলে যায়।

লোরিস মেলিকভ ঘরে ঢুকতেই হাজি মুরাদ আনন্দদীপ্ত মুখে তাকে সংবর্ধনা করে।

ডিভানের পর আরাম করে বসে জিজ্ঞাসা করে, কি, আবার বলব?

নিশ্চয়। লোরিস মেলিকভ জানায়।—আমি আপনার অনুচরদের সঙ্গে কথা বলছিলাম······একজন বেশ দিলদরিয়া।

হাঁ, খান মহমাটা ভারি চঞ্চল! হাজি মুরাদ বলে।

সুদর্শন যুবকটিকে আমার ভাল লেগেছে।

ওঃ, ওর নাম এলদার। যুবক হলেও বেশ দৃঢ়চেতা······ লোহা দিয়ে তৈরী! তারপর দুজনেই চুপ করে।

তাহলে আবার বলছি!

বলুন!

যাঁদের হত্যার কথা আপনাকে বলেছি।······তাদের খুন করে হামজাদ খুন জাখে এসে প্রাসাদে আস্তানা নেয়। গোটা

পরিবারে তখন একমাত্র খানশাই বেঁচে আছেন। হামজাদ তাকে ডেকে পাঠায়। তিনি তাকে ভৎসনা করেন। মুরিদ আসেলদারকে হামজাদ তখন চোখের ইসারা করে এবং পেছন থেকে আঘাত করে সে তাঁকে হত্যা করে।

তাকে খুন করল কেন? লোরিস মেলিকভ জিজ্ঞাসা করে।

কি আর করতে পারে? সামনের পা যেদিকে যায় পেছনের পা'ও সেই দিকেই চলে। গোটা পরিবারকে সে খুন করে।

শামিল খুন করে ছোট ছেলেকে—পাহাড়ের চূড়া থেকে খাদের মধ্যে ফেলে দেয়।

গোটা আভেরিয়া তখন হামজাদের অধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু আমি আর আমার ভাই করলাম না। খাঁদের খুনের বদলে তার খুন চাই—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা আনুগত্য স্বীকারের ভান করলাম। সব সময় ভাবছি কি করে শোধ নেব। পিতামহের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। ঠিক করলাম যে প্রাসাদ থেকে না বেরোন অবধি অপেক্ষা করব, তারপর গোপনে ওঁৎ পেতে খুন করব। কে একজন আড়ি পেতে আমাদের কথা শোনে এবং হামজাদকে বলে দেয়। সে তখন পিতামহকে ডেকে বলে, মনে রেখ তোমার পৌত্ররা যদি আমার অনিষ্ট করে তো একই হাড়িকাঠেই তোমাদের তিনজনকে ঝোলাব। আল্লার কাজ করছি আমি……কোন বাধা দেওয়া চলবে না……যাও, খেয়াল থাকে যেন!

পিতামহ বাড়ী ফিরে সব কিছুই বল্লেন।

আমরা তখন ঠিক করলাম যে আর দেরি করা উচিত হবে না। মসজিদে ভোজের প্রথম দিনেই কাজ সারব। সাথীরা যোগ দিতে ভরসা পেল না। আমি আর দাদা অনড় রইলাম।

দুজনেই দুটো করে পিস্তল নিলাম এবং বোরকা পরে মসজিদে গেলাম। ত্রিশজন মুরিদ নিয়ে হামজাদ আসে। সবাইর হাতে খোলা তরোয়াল। হামজাদের প্রিয় মুরিদ আস্লেদার (খানশাকে যে খুন করে) আমাদের চিনতে পারে এবং থামবার হুকুম দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। আমার হাতে ছোরা ছিল, তাই দিয়ে তাকে সাবাড় করলাম। তারপর ছুটলাম হামজাদের দিকে। কিন্তু আমার ভাই ইতি-মধ্যেই তাকে গুলি করে। তখনও সে বেঁচে ছিল। আমি তার মাথায় শেষ ঘা' দিলাম। ওপক্ষে ত্রিশজন মুরিদ আর আমরা মাত্র দুজন। আমার ভাই ওসমানকে ওরা খুন করে। আমি একা সবাইকে রুখি এবং জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে আসি।

হামজাদের মৃত্যু সংবাদ শুনে জনতা বিদ্রোহ করে। মুরিদরা পালিয়ে যায়। যারা পালাতে পারল না তারা খুন হল।

এই সময় হাজি মুরাদ থামে এবং টেনে শ্বাস নেয়। তার পর আবার বলে, এ অবধি ভাল ভাবেই চলে ; তারপর সব ভেস্তে যায়। শামিল হামজাদের গদী দখল করে। দূত মারফত সে সংবাদ পাঠায় যে রুশদের আক্রমণ করতে আমি

যদি তার সঙ্গে যোগ না দিই তো সে খুনজাখ আক্রমণ করে আমায় খুন করবে। আমি বলে পাঠালাম, আমি তো যোগ দেবই না, কাকেও কাছে ঘেঁষতে দেব না।

যোগ দিতে অস্বীকার করলেন কেন? লোরিস মেলিকভ জিজ্ঞাসা করে।

হাজি মুরাদ ভ্রূকুঞ্চিত করে। চট করে কোন জবাব দিল না।

যোগ দিতে আমি পারি না। আমার ভাই ওসমান আর আবু নুতসল খাঁর খুনে তার হাত রঞ্জিত। তাই তার পক্ষে গেলাম না। জেনারেল রোজেন আমাকে অফিসারের কমিশন পাঠিয়ে আভেরিয়ার নায়েবি করতে হুকুম দেন। এর ফল ভালই হত; কিন্তু সেই রোজেনই আবার কাজি খুনজাখের খাঁ হিসাবে প্রথমে মহম্মদ মুর্জা, পরে আখমত খাঁকে নিয়োগ করেন। আখমত খাঁ আমায় ঘৃণা করত। খানশার মেয়ে সুলতানার সঙ্গে সে ছেলের বিয়ে দিতে চায়। খানশা রাজী হননি; কিন্তু তার ধারণা আমিই বাধা দিয়েছি। হাঁ, আখমত খাঁ ঘৃণা করত আমাকে। আমায় খুন করবার জন্য সে অনুচর পাঠায়, কিন্তু আমি রক্ষা পাই। জেনারেল ক্লুগেনাউর কাছে সে তখন আমার নিন্দা করে। বলে, আমি নাকি রুশ সৈন্যদের কাঠ যোগান দিতে নিষেধ করেছি আভরদের। আরও বলে, আমি নাকি পাগড়ি পরেছি···এইটা। হাত দিয়ে হাজি মুরাদ মাথার পাগড়িটা দেখায়। তার অর্থ, আমি শামিলের পক্ষে যোগ দিয়েছি। জেনারেল তার কথায় বিশ্বাস করেননি এবং আমার

কোন অনিষ্ট না করার হুকুম দেন। কিন্তু তিনি তিফলিসে চলে গেলে আখমত খাঁ যথেচ্ছ আচরণ করতে থাকে। আমাকে বন্দী করার জন্য এক কোম্পানী সৈন্য পাঠায় এবং শৃঙ্খলিত করে কামানের সঙ্গে বেঁধে রাখে।

ছয়দিন ঐ ভাবে ছিলাম। সপ্তমদিন বাঁধন খুলে আমায় নিয়ে তেমির খাঁ সুরার দিকে রওনা হয়। চল্লিশজন সৈনিক গুলিভরা বন্দুক সহ আমায় পাহারা দিচ্ছিল। আমার হাত বাঁধা। জানতাম, পালাবার চেষ্টা করলে হত্যা করার হুকুম তাদের আছে।

মানসোখার কাছাকাছি এলে পথটা সঙ্কীর্ণ হয়। ডানদিকে প্রায় একশ বিশ ফুট গভীর খাদ। আমি ডান দিকে গেলাম··· প্রায় খাদের পাড়ে। একজন সৈনিক আমায় বাধা দেবার চেষ্টা করে; কিন্তু আমি লাফ দিই এবং তাকেও আমার সঙ্গে টেনে নেই। সে সরাসরি মারা যায়, কিন্তু আমি······দেখছেনই তো বেঁচে আছি!

পাঁজর, মাথা, হাত, পা সব ভেঙে যায়। হামাগুড়ি দেবার চেষ্টা করলাম; কিন্তু মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি। রক্তে চুপচুপ অবস্থায় ঘুম ভাঙে। এক রাখাল আমায় দেখতে পায় এবং লোকজন ডেকে এনে আউলে নিয়ে যায়। পাঁজর ও মাথার আঘাত সেরে যায়। পা ভাঙাও সারে, তবে একটু খাটো হয়ে যায়। বাঁকা পাখানি বাড়িয়ে দেয় হাজি মুরাদ।

—তাহলেও এখনও কাজ দিচ্ছে—আর কি চাই? সে বলে।

লোকজন এই কথা শুনে আমায় দেখতে আসে। সেরে উঠে আমি তসেলমেসে যাই। আভররা তখন আমায় আবার নায়েবি করতে বলে। শান্তভাবে সগর্বে সে বলে।—আমিও রাজী হই!

চটপট উঠে গিয়ে জিনে লাগান ব্যাগ থেকে ছুখানা রঙওঠা চিঠি বার করে একখানা সে লোরিস-মেলিকভের হাতে দেয়। চিঠিখানা জেনারেল ক্লুগেনাউর। লোরিস মেলিকভ প্রথম চিঠিখানা পড়েঃ

লেফটন্যাণ্ট হাজি মুরাদ, আপনি আমার অধীনে কাজ করছেন। আমি আপনার উপর সন্তুষ্ট এবং আপনাকে সৎলোক বলে গণ্য করি।

ইদানীং আখমত খাঁ আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, আপনি বিশ্বাসঘাতক, আপনি পাগড়ি পরেছেন এবং শামিলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন; আর লোকজনকে আপনি রুশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণের শিক্ষা দিচ্ছেন। আপনাকে গ্রেফতার করে আমার সামনে হাজির করার আদেশ আমি দিয়েছি। কিন্তু আপনি পালিয়ে গেছেন। জানি না এ ভাল কি মন্দ। আবার এও জানি না আপনি দোষী কি নির্দ্দোষী।

এখন আমার কথা শুনুন। আপনার মন যদি নিষ্পাপ হয়, কিম্বা রুশ জারের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় যদি আপনি করে না থাকেন তো আমার কাছে চলে আসুন। কোন ভয় নেই। আমি আপনার রক্ষক। খাঁ আপনার কিছুই করতে পারবে না;

কারণ সেও আমার কমাণ্ডের অধীন। কাজেই কোন ভয় আপনার নেই।

এরপর ক্লুগেনাউ লিখেছেন যে তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং সব সময় তার কথা রক্ষা করেন। পরিশেষে আবারও তিনি হাজি মুরাদকে আসতে অনুরোধ করেছেন।

লোরিস মেলিকভ পত্রখানা পড়বার পর দ্বিতীয়খানা তার হাতে দেবার আগে হাজি মুরাদ প্রথম পত্রের জবাবে যা লিখেছিল তাই শোনায় ঃ

আমি লিখেছিলাম, শামিলের জন্য আমি পাগড়ি পরিনি, পরেছি আমার আত্মার মুক্তির জন্য। শামিলের পক্ষে যোগ দেবার ইচ্ছাও আমার নেই কারণ, আমার বাপ ভাই ও আত্মীয়স্বজনের খুনে তার হাত রঞ্জিত। কিন্তু রুশপক্ষেও আমি যোগ দিতে পারি না, কেননা তারা আমার অসম্মান করেছে। খুনজাখে শৃঙ্খলিত অবস্থায় এক পাজি আমার উপর থুথু ফেলেছে। সেই লোকটাকে না খুন করলে আমি আপনাদের পক্ষে যোগ দিতে পারি না। সর্বোপরি আমার ভয় ঐ মিথ্যাবাদী আখমত খাঁকে। তখন জেনারেল আমাকে এই চিঠিখানা লেখেন।

আর একখানা রঙওঠা কাগজ লোরিস মেলিকভের হাতে দেয় হাজি মুরাদ।

লোরিস মেলিকভ পড়ে যায় ঃ আমার পত্রের উত্তর দিয়েছেন, সেজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি লিখেছেন যে

আসতে কোন ভয়ই আপনার নেই, তবে ঐ অপমানটা বাধা সৃষ্টি করছে। আমি কথা দিচ্ছি, রুশ আইন ন্যায়নিষ্ঠ। যে আপনাকে অপমান করবার দুঃসাহস করেছে, আপনার চোখের সামনেই তার শাস্তি হবে। আমি ইতিমধ্যেই তদন্তের আদেশ দিয়েছি।

শুনুন, হাজি মুরাদ! আমাকে বিশ্বাস না করার দরুণ আমার অসন্তুষ্ট হবার কারণ আছে। কিন্তু আপনাকে মার্জনা করছি; কেননা আমি জানি পাহাড়েরা স্বভাবতই সন্দিগ্ধ। আপনার মন যদি নিষ্পাপ হয়, শুধু আত্মার মুক্তির জন্যই যদি আপনি পাগড়ি পরে থাকেন তো ঠিকই করেছেন। তাহলে বুক ফুলিয়ে আমার বা রুশ সরকারের সম্মুখীন হবার কোন বাধাই আপনার থাকতে পারে না। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, আপনার অপমান কারীর শাস্তি হবে এবং আপনার যাবতীয় সম্পত্তিও প্রত্যর্পণ করা হবে। আপনি দেখতে পাবেন রুশ আইন আসলে কি! তাছাড়া, রুশরা ভিন্নদৃষ্টিতে সবকিছু বিচার করে। একটা পাজি আপনাকে অসম্মান করেছে বলেই আপনি আমাদের কাছে ছোট হয়ে যান নি।

আমি নিজেই চিরমিন্তদের পাগড়ি পরার অনুমতি দিয়েছি। তাদের কাজ আমি সঙ্গত বলেই গণ্য করি। কাজেই আবারও বলছি, আপনার কোন ভয় নেই। পত্রবাহকের সঙ্গে আমার এখানে চলে আসুন। পত্রবাহক আমার বিশ্বস্ত লোক, আপনার শত্রুর অনুগত নয়। গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহভাজন একজন লোকের বন্ধু পত্রবাহকটি।

অতঃপর ক্লুগেনাউ আবারও হাজি মুরাদকে আসবার জন্য সম্মত করার চেষ্টা করেন।

লোরিস মেলিকভের পড়া শেষ হয়ে গেলে হাজি মুরাদ বলে, আমি তাকে বিশ্বাস করতে পারিনি। ক্লুগেনাউর কাছে গেলাম না। আখমত খাঁ-এর উপরে প্রতিশোধ নেওয়া আমার মুখ্য কাজ এবং রুশপক্ষে গেলে তা সম্ভব নয়। এরপর তসেলমেস ঘেরাও করে আখমত খাঁ আমাকে বন্দী কিংবা হত্যা করার চেষ্টা করে। সামান্য জনকয়েক লোক ছিল আমার, কাজেই তাকে হঠাতে পারলাম না। ঠিক এই সময় শামিলের চিঠি নিয়ে একটি লোক আসে। পত্র মারফত সে আখমতকে হত্যা করার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আমাকে গোটা আভেরিয়ার নায়েব করবার আশ্বাস দেয়। অনেকক্ষণ বসে বিষয়টি চিন্তা করলাম। তারপর যোগ দিলাম শামিলের পক্ষে। সেই অবধি বরাবর রুশদের বিপক্ষে লড়েছি।

অতঃপর হাজি মুরাদ তার সামরিক কৃতিত্বের বর্ণনা করে। তেমন অনেক কাহিনীই ছিল। কিছু কিছু লোরিস মেলিকভের নিজেরও জানা। বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতা তার সমস্ত অভিযান ও হানার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তার অসম-সাহসিকতা, যার ফলে প্রতিটি প্রচেষ্টা সাফল্য অর্জন করেছে!

পরিশেষে হাজি মুরাদ বলে, শামিলের সঙ্গে কোন দিনই আমার দোস্তী ছিল না। আমায় সে ভয় করত; আবার

আমাকে দরকারও ছিল। একদিন ঘটনাচক্রে আমায় জিজ্ঞাসা করা হয়, শামিলের পর ইমাম কে হবে? আমি বল্লাম, যার তরোয়ালে ধার বেশী।

কথাটা শামিলের কানে ওঠে এবং সে আমায় সরাতে চায়। আমায় তাবাসরনে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে গিয়ে আমি হাজার ভেড়া আর তিনশ ঘোড়া দখল করি। সে বলে, কাজটা ঠিক করা হয়নি। আমায় নায়েবি থেকে বরখাস্ত করে এবং আমার যাবতীয় অর্থ পাঠিয়ে দেবার হুকুম দেয়। আমি তাকে হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দিলাম। সে তখন মুরিদ পাঠিয়ে আমার যাবতীয় সম্পত্তি কেড়ে নেয়। সে হুকুম করে যে আমায় তার কাছে যেতে হবে। আমি জানতাম, সে আমাকে খুন করতে চায়; তাই গেলাম না। তখন আমায় বন্দী করার চেষ্টা করে। প্রতিরোধ করে আমি ভরন্তসভের কাছে চলে আসি। কিন্তু সপরিবারে আসতে পারিনি। আমার মা, স্ত্রীরা এবং পুত্র তার হাতে বন্দী। সর্দারকে বলবেন, আমার পরিবারের লোক যতদিন শামিলের হাতে থাকবে ততদিন কিছুই করতে পারব না।

লোরিস মেলিকভ বলে, বলব।

কাহিনী শেষ করে হাজি মুরাদ বলে, একটু কষ্ট করুন— চেষ্টা করুন। আমার সব কিছুই আপনার। শুধু সর্দারের কাছে আমার হয়ে বলুন! আমার গলায় ফাঁস পরান—দড়ির ওমুখ শামিলের হাতে!

২০শে ডিসেম্বর সমর সচিব চার্নিশভের কাছে পত্র লেখেন ভরন্তসভ। পত্রখানি ফরাসীতে লেখা ঃ

প্রিয় প্রিন্স, গত ডাকে আপনার কাছে পত্র লিখিনি, কারণ হাজি মুরাদ সম্পর্কে ইতিকর্তব্য আগে স্থির করে নিতে চেয়েছি। তাছাড়া, দিন কয়েক ধরে আমার শরীরও ভাল যাচ্ছে না।

গত পত্রে আমি হাজি মুরাদের উপস্থিতির কথা জানিয়েছি। আটই সে তিফলিসে পৌছোয় এবং পরদিন তার সঙ্গে দেখা করি। পরবর্তী সাত আট দিন তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি এবং তাকে আমাদের কোন কাজে লাগান যায় সে বিষয়ে চিন্তা করেছি। বর্তমানে সে কি কাজে লাগতে পারে বিশেষ করে তার কথাই চিন্তা করেছি। কেননা, পরিবারের ভবিষ্যত নিয়েই সে বিশেষ উদ্বিগ্ন। প্রতি সাক্ষাতের সময় অকপটে সে জানাচ্ছে, যতদিন তারা শামিলের হাতে থাকবে, তার অবস্থা পঙ্গুর মত এবং যে সহৃদয় সংবর্ধনা ও ক্ষমা সে পেয়েছে, তার প্রতিদানে কোন কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কিম্বা সেবা করা তার সাধ্যাতীত।

প্রিয়জনের ভবিষ্যত চিন্তা তাকে নিয়ত চঞ্চল করে রেখেছে। তার তদারকির জন্য যে সব লোক নিয়োগ করেছি, তারা আমায় বলছে যে রাত্রেও সে ঘুমোয় না, যৎসামান্য খায় এবং অনবরত প্রার্থনা করে। জন কয়েক কজাক সহ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাওয়া তার একমাত্র ব্যায়াম ও ক্রীড়া। ঐ একটি মাত্র

অনুরোধই করে এবং জীবনব্যাপী অভ্যাসের দরুণ এ জিনিস তার প্রয়োজনও বটে। প্রতিদিন আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে যে তার পরিবারের কোন সংবাদ পেয়েছি কি না এবং সমস্ত বন্দী জড়ো করে তার পরিবারের সঙ্গে বিনিময় করবার অনুরোধ জানায়। সামান্য কিছু অর্থ দিতেও সে রাজী। এজন্য কিছু লোক তাকে অর্থ সাহায্য করতে রাজী আছে। বারবার সে আমার কাছে বলে, আমার পরিবারকে বাঁচান, তারপর আমায় সেবা করবার একটা সুযোগ দিয়ে দেখুন (তার মতে লেসঘিয়ান রণক্ষেত্রে) ; একমাসের মধ্যে যদি আমি কিছু করতে না পারি তো যে শাস্তি ইচ্ছা দেবেন। আমি বলি, সব কিছুই আমার সঙ্গত বলে মনে হয়, যতদিন তোমার পরিবার পাহাড়ে থাকবে এবং আমাদের হাতে প্রতিভূ হিসাবে না থাকবে, ততদিন আমাদের মধ্যে তোমাকে অনেকেই বিশ্বাস করবে না। আরও বলেছি যে আমাদের সীমান্তের সমস্ত বন্দীই আমি জড়ো করব ; তবে তুমি নিজে যত অর্থ তুলতে পারবে তার অতিরিক্ত মুক্তিমূল্য দেবার বিধান আমাদের আইনে নেই, তাহলেও অন্য উপায়ে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। একথাও তাকে অকপটে বলেছি যে, আমার বিশ্বাস, শামিল কোন অবস্থাতেই তার পরিবারকে হাত ছাড়া করবে না। সরাসরি সে কথা বলেও দিতে পারে। হয়ত বলবে যে ফিরে গেলে ক্ষমা করে সে সাবেক পদে বাহাল করবে আর হাজি মুরাদ যদি না যায় তো তার মা পুত্র ও স্ত্রীদের হত্যা করবে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা

করেছি যে শামিলের কাছ থেকে এ রকম ঘোষণা পেলে সে কি করবে ? চোখ ও হাত আকাশের দিকে তুলে সে বলেছে, সব কিছুই ভগবানের হাত ; তবে শত্রুর কাছে কখনই সে আত্মসমর্পণ করবে না, তার কারণ শামিল তাকে ক্ষমা করবে না এবং ফিরে গেলে বেশীদিন আর বাঁচতে হবে না। নিজের পরিবারের বিনাশ সম্পর্কে তার ধারণা, শামিল অতটা হঠকারী হবে না। তার প্রথম কারণ, সে হাজি মুরাদকে এতটা বেপরোয়া বিপজ্জনক শত্রু বানাতে চাইবে না। দ্বিতীয়ত, দাগেস্তানে এমন বহুলোক আছে, এমন কি প্রভাবশালী লোকও আছে যারা শামিলকে প্রতিনিবৃত্ত করবে। পরিশেষে সে জানায় যে ভাগ্যে যাই থাক না কেন, বর্তমানে পরিবার পরিজনের মুক্তিমূল্য ছাড়া আর কোন কথাই সে ভাবছে না। ভগবানের নামে সে আমায় সাহায্য করতে মিনতি করল এবং চেচানিয়ার সীমান্তে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইল, যাতে আমাদের সৈন্যধ্যক্ষদের সম্মতি ও সাহায্য নিয়ে সে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এবং তাদের উদ্ধারের সর্বোত্তম পন্থা বার করতে পারে। সে বলে যে এদিককার শত্রু এলাকার বহু লোক, এমনকি কিছু নায়েবও মোটামুটি তার অনুরক্ত। রাশিয়া ইতিমধ্যেই যে সব এলাকা অধীনস্থ করেছে, কিম্বা যে সব অঞ্চল নিরপেক্ষ, সেখানকার সমস্ত অধিবাসীর সঙ্গে আমাদের সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব। সে জন্য দিবারাত্র তার মনে শান্তি নেই। এই সম্পর্ক

তার অভীষ্টলাভের সহায়ক হবে। অভীষ্টসিদ্ধি হলে সে মানসিক শান্তি পাবে এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য, আমাদের আস্থালাভের উদ্দেশ্যে কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে।

বিশ কি ত্রিশজন বাছাই কজাকসহ সে গ্রজনিতে ফিরে যেতে চাইছে। এই বাছাই দলটি তাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে, অপর পক্ষে তার সদিচ্ছার প্রতিশ্রুতি যাচাই করার জন্যও এরা আমাদের হয়ে কাজ করতে পারে।

আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন প্রিয় প্রিন্স যে, এই সব ব্যাপারে আমি অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি। কারণ যা-ই করি না কেন, আমার উপর মস্ত এক দায়িত্ব এসে পড়ে। পুরোপুরি ওকে বিশ্বাস করা চরম হঠকারিতার শামিল। আর পলায়নের সমস্ত পথ রুদ্ধ করতে হলে তাকে চাবি দিয়ে আটকে রাখতে হয়। আমার মতে সেটাও অন্যায় অসৌজন্য হবে। এ রকম কিছু করলে সে সংবাদ গোটা দাগেস্তানে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে আজকে যারা প্রকাশ্যে শামিলের বিরোধিতা করতে চাইছে তারাও বেঁকে বসবে। এমন বহু লোকই আছে। কিন্তু তাতে আমাদের গুরুতর ক্ষতি। ইমামের সব চাইতে সাহসী ও দুর্ধর্ষ অফিসার আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হওয়ায় আমরা তার সঙ্গে কেমন আচরণ করি, এই যারা লক্ষ্য করছে তারাও রুষ্ট হবে। আমরা যদি হাজি মুরাদকে বন্দী করি তো বর্তমান পরিস্থিতির সমস্ত শুভ সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই যে ব্যবহার করা

হচ্ছে, তার অন্যথা করা আমি সঙ্গত মনে করিনি। কিন্তু হাজি মুরাদ যদি আবার পালিয়ে যায় তো আমার আচরণ প্রচণ্ড ভুল বলে গণ্য হবে। এই রকম জটিল পরিস্থিতিতে ভুলের ঝুঁকি না দিয়ে কিম্বা কিছুটা দায়িত্ব গ্রহণ না করে কোন সোজা পথ অনুসরণ করা অসম্ভব না হলেও দুস্কর। কিন্তু কোন পথ সঙ্গত বলে গ্রহণ করলে, যা-ই ঘটুক না কেন, সে পথ আমায় অনুসরণ করতেই হবে।

আমার বিনীত অনুরোধ, বিষয়টি আপনি মহামান্য সম্রাটের কাছে পেশ করবেন। আমাদের মহান রাজা যদি আমার পন্থা খুশি হয়ে অনুমোদন করেন তাহলে আমি বিশেষ প্রীত হব।

আপনাকে এই যে সব কথা লিখলাম, হাজি মুরাদের সঙ্গে সঠিক ব্যবহারের জন্য সে কথা আমি জেনারেল জাভোদ-ভস্কি এবং কোজলভস্কিকেও লিখেছি। আর হাজি মুরাদকে সতর্ক করে দিয়েছি যাতে কোজলভস্কির সম্মতি ছাড়া সে কোন কাজ না করে কিম্বা কোথাও না যায়। তাকে একথাও বলেছি যে আমাদের রক্ষীদলসহ বেরুনোই তার পক্ষে ভাল; না হলে শামিল গুজব রটাতে পারে যে আমরা তাকে বন্দী করে রেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে তাকে দিয়ে আমি হলপ করিয়ে নিয়েছি যাতে ভোজদভিজেনস্কে সে না যায়, কারণ আমার পুত্র, যার কাছে প্রথম সে আত্মসমর্পণ করে এবং যাকে সে কুনাক (বন্ধু) বলে গণ্য করে, ওখানকার কমাণ্ডার নয়।

কাজেই সেখানে গেলে অনায়াসেই বিচ্ছিরি ভুল বোঝাপড়া দেখা দিতে পারে। তাছাড়া ভোজদভিজেনস্ক জনবহুল একটা বিরুদ্ধপক্ষীয় বস্তির অতি সন্নিকটে, সুতরাং তার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার পক্ষে গ্রজনিই সব দিক থেকে ভাল।

যে বিশজন বাছাই কজাক তার সঙ্গে দিয়েছি, তাছাড়াও তার অনুরোধে ক্যাপ্টেন লোরিস মেলিকভকে সঙ্গে পাঠাচ্ছি। লোরিস মেলিকভ অতি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সুযোগ্য অফিসার। তাছাড়া সে অনর্গল তাতার ভাষা বলতে পারে আর হাজি মুরাদেরও পূর্ণ আস্থাভাজন। হাজি মুরাদ যে দশদিন এখানে ছিল, তখন সে শৌশিল জেলার সৈন্যাধ্যক্ষ লেফট্ন্যাণ্ট কর্নেল প্রিন্স তারখানভের সঙ্গে এক বাড়ীতেই থাকে। চাকুরি সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি এখানে এসেছিলেন। তিনি সুযোগ্য এবং আমার পরম বিশ্বাসভাজন। প্রিন্সও হাজি মুরাদের আস্থা অর্জন করেছেন এবং তিনি ভাল তাতার ভাষা জানেন বলে তার মারফত আমি হাজি মুরাদের সঙ্গে জটিল ও গোপন বিষয়ে আলোচনা চালিয়েছি। হাজি মুরাদ সম্পর্কে প্রিন্স তার-খানভের সঙ্গেও আমার আলোচনা হয়েছে। তিনিও আমার সঙ্গে একমত যে হয় আমি যা করেছি তাই করতে হয়, আর তা না হলে কঠোর পাহারায় হাজি মুরাদকে কারাগারে রাখতে হয়। কারণ একবার আমরা খারাপ ব্যবহার করলে তাকে আটকে রাখা সহজ নয়। আর তাও যদি না হয় তো তাকে

এদেশ থেকে সরিয়ে দিতে হয়। কিন্তু হাজি মুরাদের সঙ্গে শামিলের ঝগড়ায় সে শুভ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এই শেষোক্ত দুই পন্থায় তার সবকিছুই নষ্ট হয়ে যাবে। এবং শামিলের বিরুদ্ধে জনতার অবাধ্যতার বর্তমান মনোভাব কিম্বা তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত বাধাপ্রাপ্ত হবে। প্রিন্স তারখানভ আমায় বলেছেন যে হাজি মুরাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তার কোন সন্দেহ নেই।

হাজি মুরাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস যে ক্ষমা প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিলেও শামিল কোনদিন তাকে ক্ষমা করবে না। এবং তাকে বধ করবে। তার সঙ্গে আলোচনায় প্রিন্স তারখানভ একটি মাত্র জিনিস লক্ষ্য করেছেন যা পরে দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। সে তার ধর্মের প্রতি আকর্ষণ। তারখানভ অস্বীকার করেন না যে শামিল হয়ত এইদিক থেকে তাকে আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু তাহলেও আগেই আমি বলেছি যে ফিরে গেলে শিগগির কিম্বা পরে তাকে বধ করা হবে না এ আস্থা শামিল কিছুতেই হাজি মুরাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারবে না।

আমাদের এখানকার এই ঘটনা সম্পর্কে এইটুকুই আমার বক্তব্য প্রিস্ প্রিন্স!

১৮৫১ সালের ২০শে ডিসেম্বর তিফলিস থেকে এই রিপোর্ট পাঠান হয়। ডজনখানেক ঘোড়ায় চড়ে এবং জন বারো চালককে চাবকে লাল করে নববর্ষের আগের দিন এক দূত

প্রিন্স চার্নিশভের হাতে চিঠিখানা দেয়। চার্ণিশভ তখন সমর সচিব। ১৮৫২ সালের পয়লা জানুয়ারি ভরন্তসভের এই রিপোর্ট সম্রাটের দরবারে পেশ করে চার্নিশভ।

ভরন্তসভকে সবাই শ্রদ্ধা করে বলে চার্নিশভ তাকে দেখতে পারতেন না। তার অসামান্য বৈভবের জন্যও ঈর্ষা করতেন। তাছাড়া ভরন্তসভ হলেন বনেদী অভিজাত আর চার্নিশভকে বড়জোর ভদ্রলোক বলা যায়। সম্রাট ভরন্তসভের প্রতি বিশেষ প্রীত বলেও তিনি রুষ্ট। কাজেই সুযোগ পেলেই চার্নিশভ তাকে খোঁচা মারবার চেষ্টা করতেন।

ককেসাসের পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বশেষ রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে তিনি ভরন্তসভের প্রতি নিকোলাসের বিরক্তি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। কারণ পরিচালকের অসাবধানতায় পাহাড়দের হাতে প্রায় গোটা একটি ক্ষুদ্র ককেসীয় সৈন্যদল বিনষ্ট হয়ে যায়। এবারও হাজি মুরাদ সম্পর্কে ভরন্তসভের কার্যাবলীকে তিনি বিরূপ সমালোচনা করার মনস্থ করেন। সম্রাটকে তিনি বলবেন বলে ঠিক করলেন যে ভরন্তসভ বরাবর স্থানীয় অধিবাসীদের এমনভাবে প্রশ্রয় ও আস্কারা দেন যে রুশদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হয়; এবারেও হাজি মুরাদকে ককেসাসে থাকতে দিয়ে তিনি অনুচিত কাজ করেছেন। কারণ একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে গুপ্তভাবে আমাদের রক্ষা-ব্যবস্থা জেনে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে সে এসেছে। কাজেই তাকে মধ্য রাশিয়ায় পাঠান সর্বতোভাবে উচিত ছিল। পাহাড়েদের হাতে

থেকে তার পরিবার পরিজন উদ্ধার করে আনতে পারলে এবং তার আনুগত্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া গেলে তখন তাকে কাজে লাগান যেতে পারত।

চার্নিশভের পরিকল্পনা ভেস্তে যায় শুধু এই কারণে যে নববর্ষের দিন সম্রাট নিকোলাসের মেজাজ বেজায় বিচ্ছিরি ছিল। নিজের বিকারগ্রস্থতার দরুণ সেদিন কোন লোকের কোন সুপারিশই তিনি গ্রহণ করেননি। চার্নিশভের কাছ থেকে তো নয়ই। কারণ সাময়িকভাবে অপরিহার্য বলেই তাকে তিনি সয়ে যাচ্ছেন। তা না হলে তাকে তিনি শয়তান বলেই গণ্য করেন। কেননা ডিসেমব্রিস্টদের (১) বিচারের সময় চার্নিশভের অপচেষ্টা তাঁর অজানা নয়। জাকেরি চার্নিশভকে জেলে পাঠিয়ে এই চার্নিশভ তার সম্পত্তি আত্মস্মাৎ করার চেষ্টা করে। কাজেই নিকোলাসের বদমেজাজের জন্য হাজি মুরাদ ককেসাসেই থেকে যায়। চার্নিশভ যদি অন্য সময় রিপোর্ট পেশ করতো তো তার অবস্থা বদলে যেত। কিন্তু তা হল না।

ফারেনহাইট হিমাঙ্কের তেরো ডিগ্রী নীচে নেমে গেছে থার্মমিটার। কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে বেলা সাড়ে নটার সময়

(১) ১৮২৫ সালে প্রথম নিকোলাসের সিংহাসনে আরোহণের পর একদল সামরিক ষড়যন্ত্রকারী রাশিয়ার জন্য এক শাসনতন্ত্র আদায়ের চেষ্টা করে। এরাই ডিমেসব্রিস্ট নামে খ্যাত।

চার্নিশভের হোতকা দাড়িওলা কোচোয়ান উইণ্টার প্রাসাদের তোরণদ্বারে উপনীত হয়। নিকোলাস যেমন শ্লেগায় ঘুরে বেড়ান তেমনি ছোট একখানা শ্লেগার কোচবাক্সে বসে আছে লোকটি। মাথায় কোনাচে কুশনাকৃতি নীল ভেলভেটের টুপি। দোস্ত প্রিন্স দলগোরুকির কোচোয়ানকে ঘাড় নেড়ে সম্ভাষণ জানিয়ে সে এগিয়ে যায়। প্রভুকে প্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে দোসরা কোচোয়নটি অনেকক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করছে…আর পুরু কোট মুড়ি দিয়ে বলগার পর বসে বসে অসাড় করতল রগড়াচ্ছে। চার্নিশভের মাথায় মোরগের পালক লাগান তিন কোনা টুপি, গায়ে প্রসস্ত স্কন্ধাবরণওলা লম্বা কোট আর সাদা বীভারের লোমের কলার। শ্লেগার ভালুকের চামড়ার ঢাকনিটা পা থেকে সরিয়ে দিয়ে চার্নিশভ সযত্নে শীতে অসাড় পা বার করে। জুতোর উপর জুতো (ওভার-সু) সে পরেনি। কোন দিনই পরে না। এজন্য সে গর্ব্ব করে। জুতোর কাটায় ঠুন্ ঠুন্ শব্দ করে চালের মাথায় চটপট সে কার্পেটবিছান সিড়ি বেয়ে উঠে যায় এবং হলঘরের দরজা পার হয়ে যায়। সসম্ভ্রমে কপাট খুলে দেয় প্রহরী। হলঘরে ঢুকে চটপট সে ক্লোকটা ছুঁড়ে ফেলে। রাজসভার এক বৃদ্ধ পরিচারক অমনিই ছুটে এসে ক্লোকটা ধরে। আয়নার সামনে গিয়ে চার্নিশভ সন্তর্পণে কোঁকড়ান পরচুলা থেকে টুপিটি খুলে নেয়। তারপর আয়নায় নিজের মুখ দেখে একে একে সে কানের উপরের চুল এবং কপালের উপরের গুচ্ছটি অভ্যস্ত কায়দায় ঠিক করে নেয়, গলায়

ঝুলান ক্রশচিহ্নটি যথাস্থানে রাখে এবং উর্দির কাঁধের রজ্জুগ্রন্থি আর বড় বড় অক্ষরে লেখা এপলেট ঠিক করে দেয়। বেশ বিন্যাসের পর আবার সে ধীরে ধীরে কার্পেটে মোড়া সিড়ি বেয়ে উঠতে থাকে। চটাল সিড়ি ভেঙ্গে সন্তর্পণে চলে শীর্ণপদ বৃদ্ধ। জমকালো তকমাপরা রাজসভার পরিচারকদের সামনে দিয়ে চার্নিশভ প্রতীক্ষা-কক্ষে যায়। পরিচারকেরা সকলেই সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে। সম্রাটের নবনিযুক্ত এক পার্শ্বচর প্রতীক্ষা কক্ষে তাকে সসম্মানে সংবর্ধনা করে। যুবকটির গায়ে ঝকঝকে নতুন উর্দি, কাঁধে রজ্জুগ্রন্থি আর এপলেট। মুখখানা এখনও কচি—গোলাপী। ওষ্ঠে ছোট্ট কালো একটি গোঁফ আর রগের চুল সম্রাটের কায়দায় চোখের দিকে উলটিয়ে আঁচড়ান।

সহকারী সমর সচিব প্রিন্স ভাসিলি দলগোরুকিও অবসন্ন মুখে তাকে সংবর্ধনা করে। তার বিষণ্নমুখেও পার্শ্বচরটির মত গোঁফ এবং কানের পাশের চুল সম্রাটের মত আঁচড়ান।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মন্ত্রণা-কক্ষের দরজার দিকে চেয়ে পার্শ্বচরকে ফরাসীতে জিজ্ঞাসা করে চার্নিশভ, সম্রাট আছেন? মহামান্য সম্রাট এখুনি ফিরেছেন! ফরাসীতে জবাব দেয় পার্শ্বচর। তার কণ্ঠে সুস্পষ্ট আত্মপ্রসাদের ভাব ফুটে বেরোয়। পা টিপে টিপে মন্ত্রণাকক্ষের দরজার কাছে গিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। এমন সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলে যে মাথায় একটা জলের পাত্র বসিয়ে দিলেও নড়ত না। যাবার সময় তার সারা দেহে শ্রদ্ধায় গদগদ ভাব ফুটে বেরোয়।

দলগোরুকি এই সময় পোর্টফোলিতে ব্যাগ খুলে দেখে যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র আছে কিনা। চার্নিশভ এদিকে অসাড় পায়ে রক্ত সঞ্চালনের জন্য ভুরু কুঁচকে পায়চারি করতে থাকে আর মনে মনে আওড়ায় যে সম্রাটের কাছে কি বলবে। আবার যখন মন্ত্রণাকক্ষের কপাট খোলে, সে তখন দরজার কাছেই ছিল। আগের চাইতেও উৎফুল্ল ও সশ্রদ্ধভাবে পার্শ্বচরটি বেরিয়ে এসে মন্ত্রী ও তার সহকারীকে মন্ত্রণাকক্ষে ঢুকবার ইঙ্গিত করে।

এই সময়ের অনেকদিন আগেকার এক অগ্নিকাণ্ডের পর উইণ্টার প্রাসাদ পুনর্নির্মান করা হয়েছে। কিন্তু নিকোলাস এখনও উপর তলার কক্ষে আছেন। চারটে বিরাট জানালাওলা মন্ত্রণা-কক্ষটি মস্ত বড়। এখানেই নিকোলাস মন্ত্রী এবং ঊর্ধতন সরকারী কর্মচারীদের আর্জি শ্রবণ করেন। কক্ষটির সামনের দিকে দেয়ালে সম্রাট আলেকসন্দারের বিরাট এক প্রতিকৃতি ঝুলানো। জানালার ফাঁকে দুখানা দেরজওলা ডেক্স। দেওয়ালের গায়ে খানকয়েক চেয়ার সাজানো। কক্ষের মাঝা-মাঝি বিরাট একখানা লিখবার টেবিল এবং নিকোলাসের বসবার জন্য হাতলওলা একখানা চেয়ার। সম্রাট যাদের দর্শন দেন তাদের জন্যও খানকয়েক চেয়ার আছে।

কালো কোটপরা নিকোলাস বসে আছেন টেবিলের পাশে। কোটের কাঁধে রজ্জুগ্রন্থি আছে কিন্তু এপলেট নেই। বিরাট ভুঁড়িওলা তার বিশাল বপু চিতিয়ে আছে। নিষ্প্রাণ স্থির

দৃষ্টিতে আগন্তুকদের দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। তার লম্বাপনা ম্রিয়মান মুখ আর ক্রমবর্ধমান প্রশস্ত কপাল আজকে পাথরের মত ঠাণ্ডা। নিকোলাসের তুটি কেশগুচ্ছ এমন সযত্নে সুনিপুন ভাবে উলটে আঁচড়ে পরচুলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যাতে কপালের টাকটা ঢাকা পড়ে। চোখ তুটো তার বরাবরই নিস্প্রভ ; আজকে আরও বেশী নিস্প্রভ দেখাচ্ছে। উপর দিকে তা দেওয়া তার গোঁফের নীচে চাপা ঠোঁট। গাল অবধি উঁচু কলার আর সত্ত কামান গালে-লাগা গালপাট্টার খোঁচা খোঁচা দাড়িতে মুখখানা আজকে অপ্রসন্ন, খানিকটা ক্ষুব্ধ বলেই মনে হয়। ক্লান্তির জন্যই মেজাজটা আজকে ভাল নেই। গত রাত্রে তিনি এক মুখোশ মেলায় গিয়েছিলেন। অভ্যাস অনুযায়ী অশ্বারোহী প্রহরীদলের উর্দি পরে পাখী বসান শিরস্ত্রাণ মাথায় দিয়ে ভীড়ের মধ্যে হাঁটা চলা করবার সময় তার বিশাল বপু, তার গটমট করে আত্ম-প্রত্যয়ের দেমাকে চলবার ভঙ্গী দেখে জনতা ভয়ে সরে যাচ্ছিল। আগের বারের মুখোশ মেলায় যে মেয়েটির ধবধবে সাদা রঙ, সুঠাম দেহ আর স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর তার মনে জরাগ্রস্থ অক্ষম কামভাব উদ্রেক করে, আজকেও আবার তিনি সেই মুখোশটির সম্মুখীন হন। পরের মুখোশ মেলায় দেখা করবার কথা দিয়ে সেবারে সে ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

গত রাত্রের মুখোশ মেলায় আবার সে নিকোলাসের কাছে আসে ; কিন্তু এবারে আর তিনি তাকে ছেড়ে দেন নি। সরাসরি তাকে নিয়ে গেছেন এই উদ্দেশ্যে পূর্ব-নির্ধারিত এক বক্সে।

সেখানে তাকে একলা পাওয়ার স্থবিধা। নীরবে বক্সটির দরজার কাছে এসে পরিচারকের খোঁজে নিকোলাস এদিক ওদিক তাকান। তাকে পাওয়া গেল না। ভ্রূকুটি করে তখন নিজেই কপাট খুলে ফেলেন এবং মহিলাটিকে আগে ঢুকতে দেন।

কে যেন রয়েছে ওখানে! থমকে দাঁড়িয়ে মুখোশটি বলে।

সত্যিই লোক ছিল বক্সে। ভেলভেটে মোড়া ছোট্ট সোফার উপর এক উলহান অফিসার আর ডোমিনো-পরা (ক্লোকের মত এক ধরণের পোশাক) চুল কোঁকড়ান স্থন্দরী এক তরুণী বসেছিল। মুখোশ খুলে ফেলেছে রূপসী। নিকোলাসের ক্রুদ্ধ মূর্তি টান হয়ে এগিয়ে আসছে দেখেই তরুণীটি আবার মুখোশ পরে। কিন্তু ভয়ে জড়সড় উলহান অফিসারটি স্থিরদৃষ্টিতে নিকোলাসের দিকে চেয়ে কাঠের মত সোফায় বসে থাকে।

নিকোলাস বরাবরই অফিসারদের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করতেন। অফিসারদের এই ভীতি দেখে তিনি খুশিই হতেন! মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত ভাবে এই ভীতি-বিহ্বল অফিসারদের সঙ্গে দুচারটে সদয় কথা বলে তিনি তাদের চমকে দিতেন। এবারেও সেই ব্যতিক্রম ঘটল।

অফিসারকে বলেন, হাঁহে বন্ধু, তুমি তো বয়সে আমার চাইতে ছোট, আসনটা আমায় ছেড়ে দাও না!

অফিসারটি অমনিই তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে। প্রথমে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়, তারপর রাঙা হয়ে ওঠে। ভড়কে

গিয়ে প্রায় ডবল নীচু হয়ে অভিবাদন করে নীরবে সে সঙ্গিনীর পেছু পেছু বক্স থেকে বেরিয়ে যায়। নিকোলাস আর তার 'সঙ্গিনী' তখন বক্সে একলা।

বিশ বছর বয়সের সুন্দরী কুমারী মেয়েটি এক সুইডিস গভর্নেসের কন্যা! মেয়েটি নিকোলাসকে বলে যে ছেলেবেলায় ছবি দেখে সে তাঁর প্রেমে পড়ে, বরাবর পূজা করেছে তাঁকে এবং যে কোন উপায়ে তাঁর নজর পড়বে বলে মনস্থির করেছিল। আজকে তার সাধ পূর্ণ হয়েছে, কাজেই আর কিছুই সে চায় না।

সাধারণত যে প্রাসাদে নিকোলাস মেয়েদের নিয়ে বিহার করেন, মেয়েটিকে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ঘণ্টা-খানেকেরও বেশী সময় তার সঙ্গে কাটায় নিকোলাস।

সে রাত্রে বাড়ীতে ফিরে নিজের কঠিন সরু শয্যায় শুয়ে (এমনি বিছানায় শোয় বলে তার গর্বও ছিল) ক্লোকটা মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে তার অনেক সময় লাগে। এই ক্লোকটাকে তিনি নেপোলিয়নের টুপির মত প্রসিদ্ধ বলে মনে করতেন এবং মুখেও প্রকাশ করতেন সে কথা। এক একবার সুন্দরী নতুন মেয়েটির ভয়চকিত আবার উল্লসিত মুখছবির কথা ভাবছেন, পরক্ষণেই আবার মনে পড়ছে তাঁর স্থায়ী রক্ষিতার সুডোল শক্তিশালী কাঁধের কথা। কল্পনায় দুজনকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করছেন। বিবাহিত লোকের পক্ষে পরনারী গমন যে পাপ একথা তার একবারও মনে হয় নি। বরং এজন্য কেউ তাকে নিন্দা করলেই তিনি বিস্মিত হতেন। যাই হোক, ঠিক

কাজই করা হয়েছে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকলেও মনে একটা বিচ্ছিরি বিতৃষ্ণার ভাব থেকে যায় এবং সেই অনুভূতি চাপা দেবার জন্য তিনি এমন এক বিষয়ে চিন্তা করতে স্থুরু করেন যা চিরকাল তার মনে শান্তি দিয়েছে। চিন্তা করেন তার নিজের শ্রেষ্ঠত্বের কথা।

বিলম্বে ঘুমোলেও আটটার আগেই তিনি ওঠেন এবং যথা-রীতি প্রসাধন করে, বরফ দিয়ে সুডোল দেহ ঘষে আবাল্য যে প্রার্থনা করে এসেছেন সেই প্রার্থনার মন্ত্র পাঠ করেন। মুখে যে কথা উচ্চারণ করলেন তার অর্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা কোন দিনই করেননি, আজও করলেন না। প্রার্থনার পর প্রাসাদের অপেক্ষাকৃত ছোট্ট বারান্দা পার হয়ে তিনি সামরিক ক্লোক ও টুপি রাখার কক্ষে যান।

যাবার পথে আইন কলেজের উর্দিপরা একটি ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়। তারই মত বিশাল বপু ছাত্রটির! উর্দি দেখেই তিনি ছাত্রটির পরিচয় বুঝতে পারেন এবং ভ্রুকুটি করেন। কারণ এ শিক্ষায়তনের ছাত্রটির স্বাধীন আদর্শের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট। কিন্তু ছাত্রটির চেহারা আর তার সেলাম করবার ভঙ্গী নিকো-লাসের অসন্তোষ খানিকটা হালকা করে দেয়।

নাম কি তোমার? তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

পলোসাতভ, মহামান্য সম্রাট!

বেশ ছেলে!

ছাত্রটি তেমনি ভাবে সাড়ম্বরে কনুই বাঁকিয়ে টুপিতে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নিকোলাস ঘেঁষে দাঁড়ান।

সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাও ?

আদৌ না মহামান্য সম্রাট !

গবেট ! মোড় ঘুরে আবার এগিয়ে যায় নিকোলাস এবং মাথায় যে কথা আসে চড়া গলায় বারবার তাই বলতে থাকেন ঃ

কোপারভিন……কোপারভিন……। বার কয়েক বলেন। গত রাত্রের মেয়েটির নাম।—বীভৎস…বীভৎস! কি বলছেন একবারও ভেবে দেখলেন না। মনের আবেগের কণ্ঠরোধ করতে চাইলেন নিজের কথা শুনে।

হাঁ, কি দশা হবে রাশিয়ার আমি না থাকলে ? আগেকার অসন্তোষ ফিরে আসছে টের পেয়ে বলে ওঠেন।—শুধু রাশিয়া কেন, গোটা ইয়োরোপেরই বা কি দশা হবে আমি ছাড়া ? মনে মনে নিজের শ্যালক প্রুশিয়ার রাজার দুর্বলতা আর মূর্খতার কথা ভেবে তিমি মাথা ঝাঁকান।

বারান্দায় ফিরবার সময় নিকোলাস দেখতে পান যে লাল তকমা পরা সহিসসহ হেলেনা পাভলোভনার জুড়িগাড়ী ঢুকছে প্রাসাদের সলতিকভ তোরণে।

নিকোলাসের মতে এক শ্রেণীর বাজে লোক দুনিয়াতে আছে যারা শুধু বিজ্ঞান বা কবিতা নিয়েই আলোচনা করে না, এমন কি দেশ-শাসনের পদ্ধতি নিয়েও মাথা ঘামায়। ভাবে, তারা বুঝি নিকোলাসের চাইতেও ভালভাবে দেশ-শাসন করতে পারে।

তাঁর দৃষ্টিতে হেলেনা পাভলোভনা (১) এই শ্রেণীর লোকের মূর্ত প্রতীক। তিনি জানেন, যত ভাবেই এদের তিনি দমন করুন না কেন, বারেবারেই তারা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সামান্য কিছুদিন পূর্বে মৃত ভাই মিখায়েল পাভলোভচের কথা। আবার মনে একটা বিষণ্ণ বিরক্তির ভাব দেখা দেয় এবং আবার ভ্রূকুটি করে তিনি যা মনে আসে তাই বিড়বিড় করে বলতে বলতে থাকেন। প্রাসাদে ফিরে এই বিড়বিড়ানি থামে।

নিজের কক্ষে ফিরে তিনি গালপাট্টা রগের চুল আর টেকো কপালে পরচুলা ঠিকঠাক করে দেন; এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গোঁফটা উপর দিকে মুচড়ে দিয়ে আর্জি শুনবার জন্য মন্ত্রণা কক্ষে চলে যান।

প্রথমেই তিনি চার্নিশভকে ডেকে পাঠান। চার্নিশভ প্রথম চাহনিতেই তাঁর মুখ দেখে, বিশেষতঃ তাঁর চোখের ভাব দেখে বুঝতে পারে যে মেজাজটা আজ মোটেই ভাল নেই। আগের দিনের কাহিনী জানা ছিল বলে কারণ বুঝতেও বিলম্ব হল না। নিতান্ত গতানুগতিকভাবে চার্নিশভকে সম্ভাষণ জানিয়ে এবং আসন গ্রহণ করতে বলে নিস্প্রাণ দৃষ্টিতে নিকোলাস তার দিকে চেয়ে থাকেন। চার্নিশভ প্রথমে রসদখানার কর্মচারিদের এক তহবিল তছরুপের রিপোর্ট পেশ করে। ব্যাপারটি সবে ধরা পড়েছে। তারপর পেশ করে নববর্ষের খেতাব বিতরণের

(১) নিকোলাসের ভাই মিখায়েলের বিধবা স্ত্রী: বেশ বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা এবং বিজ্ঞান আর্ট আর রাজনীতিতে উৎসাহী মহিলা।

তালিকা। গতবারের তালিকায় বাদ পড়ে গেছে এমনি এক নামের তালিকা। তারপর শোনায় হাজি মুরাদ সম্পর্কে ভরন্তসভের রিপোর্ট। পরিশেষে নিবেদন করে মেডিসিনের একাডেমির ছাত্র কর্ত্তৃক এক অধ্যাপকের প্রাণনাশের চেষ্টার অপ্রীতিকর কাহিনী।

ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে নীরবে নিকোলাস তহবিল তছরুপের কাহিনী শোনেন। রিপোর্ট শুনবার সময় অনামিকায় আংটি পরা মস্ত সাদা পাঞ্জা দিয়ে ঠুক ঠুক শব্দ করছিলেন কয়েকখানা কাগজের উপর আর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন চার্নিশভের কেশগুচ্ছের দিকে।

নিকোলাসের দৃঢ় ধারণা, সকলেই চুরি করে। তিনি জানেন, এবারে তাকে রসদখানার কর্মচারিদের শাস্তি দিতে হবে। অপরাধীদের সাধারণ সৈনিক হিসাবে কাজ করতে পাঠাবেন বলে মনে মনে স্থির করলেন। তবু একথাও তিনি জানেন যে, এদের পদে এখন যারা আসবে এই শাস্তি তাদের চুরি করার বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না! চুরি করা অফিসারদের চরিত্রের ধর্ম, আবার ধরা পড়লে তাদের শাস্তি দেওয়াও রাজধর্ম। এই করে করে তিনি বিরক্ত হয়ে গেছেন, তবু এবারেও যথারীতি কর্তব্য পালন করলেন। বল্লেন, মনে হয় রাশিয়ায় একটি মাত্র সৎলোকই আছে।

চার্নিশভ অমনি বুঝতে পারে যে সেই সৎলোকটি নিকোলাস স্বয়ং এবং সঙ্গে সঙ্গে হেসে সায় দেয়।

বলে, তাই মনে হয় মহামান্য সম্রাট!

ছেড়ে দিন—এ বিষয়ে আমি রায় দেব। নথিখানা হাতে নিয়ে বাঁ পাশে রেখে তিনি বলেন।

চার্নিশভ তখন খেতাব বিতরণ এবং প্রুশিয়ার সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করা সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করে।

তালিকাটি দেখে নিকোলাস কয়েকটি নাম কেটে দেন এবং প্রুশিয়ার সীমান্তে দুই ডিভিসন সৈন্য পাঠাবার সংক্ষিপ্ত হুকুম দেন। ১৮৪৮ সালের ঘটনার পর প্রুশিয়ার রাজা জনসাধারণকে এক শাসনতন্ত্র দিতে স্বীকৃত হয়েছেন বলে নিকোলাস কিছুতেই তাকে ক্ষমা করতে পারেন নি। পত্রে এবং আলোচনা প্রসঙ্গে শ্যালকের প্রতি অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব প্রকাশ করলেও বিপদ-আপদের কথা ভেবে সীমান্তের কাছাকাছি তিনি সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত করেন। প্রুশিয়ার জনসাধারণ যদি বিদ্রোহ করে তো শ্যালকের সিংহাসন রক্ষার জন্য অনায়াসেই তিনি এ বাহিনী নিয়োগ করতে পারবেন। বছর কয়েক আগে হাঙ্গেরিতেও বিদ্রোহ দমনের জন্য তাকে নিজের সৈন্য নিয়োগ করতে হয়। নিকোলাস সর্বত্রই বিদ্রোহের বিভীষিকা দেখেন। তাছাড়া সীমান্তের কাছাকাছি সেনাবাহিনী থাকলে প্রুশিয়ার রাজাকে যে পরামর্শ তিনি দেবেন তার গুরুত্ব এবং প্রভাবও বাড়বে।

আবার তিনি ভাবেন, সত্যি, আমি না থাকলে রাশিয়ার কি দশাই যে হত!

তারপর আবার চার্নিশভকে জিজ্ঞাসা করেন, হাঁ, আর কি আছে ?

ককেসাস থেকে এক বার্তাবহ এসেছে। চার্নিশভ জানায় এবং হাজি মুরাদের আত্মসমর্পণ সম্পর্কে ভরন্তসভের রিপোর্ট বর্ণনা করে।

বটে ! বটে ! ভাল সূচনা ! নিকোলাস বলে ওঠেন।

স্পষ্টই বোঝা যায় যে সম্রাটের নিজস্ব পরিকল্পনায় কাজ শুরু হয়েছে। চার্নিশভ বলে।

নিজের সামরিক কূটবুদ্ধির এই প্রশস্তি নিকোলাসের পরম প্রীতিপ্রদ। কারণ এ নিয়ে তিনি গরব করতেন, যদিও অন্তরের অন্তঃস্থলে বুঝতেন যে এ বুদ্ধির অধিকারী তিনি নন। কাজেই নিজের বুদ্ধির বিশদ প্রশস্তি শুনবার জন্য তিনি উৎসুক হয়ে উঠলেন।

তার মানে ? তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

তার মানে সম্রাটের পরিকল্পনা যদি আগেই গ্রহণ করা হত এবং জঙ্গল সাফ করে আর খাদ্যের জোগান নষ্ট করে আমরা যদি ধীরে ধীরে একটু একটু করে এগিয়ে যেতাম তো অনেকদিন আগেই ককেসাস আমাদের অধীন হত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আর প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় এই সিদ্ধান্ত করেই হাজি মুরাদ আত্মসমর্পণ করেছে।

তা বটে ! নিকোলাস বলেন।

জঙ্গল সাফ করে আর রসদের জোগান ধ্বংস করে একটু একটু করে শত্রু এলাকায় অগ্রসর হবার পরিকল্পনা করেছে

এরমলভ আর ভেল্যামিনভ। নিকোলাসের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি চেয়েছেন শামিলের বাসস্থান দখল করে দস্যু-দলের আড্ডা ধ্বংস করতে। এই পরিকল্পনা অনুসারেই ১৮৪৫ সালে দারগো অভিযান করা হয় এবং বহু প্রাণহানি হয়। তথাপি জঙ্গল কেটে গোটা দেশ বিধ্বস্ত করে ধীরে সুস্থে একটু একটু করে অগ্রসর হবার পরিকল্পনাকেও নিকোলাস নিজের পরিকল্পনা বলে চালাতে চাইলেন। কিন্তু এই জঙ্গল সাফ করা আর খাদ্য সরবরাহ ধ্বংস করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবার পরিকল্পনা তাঁর একথা প্রতিপন্ন করাতে হলে তিনি যে ১৮৪৫ সালে সম্পূর্ণ বিপরীত অভিযানের জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন সেকথা গোপন করা আবশ্যক। কিন্তু চাপা দেওয়া তো দূরের কথা, ১৮৪৫ সালের অভিযান নিয়ে তিনি গর্ব করতেন। সেই সঙ্গে তারিফ করতেন মন্থর অগ্রগতির পরিকল্পনার। যদিও দুটো স্পষ্টত পরস্পর-বিরোধী। যথার্থ ঘটনা যাই হোক, পারিষদের ক্লান্তিহীন নীচ চাটুকারিতা তাকে এমন অবস্থায় উপনীত করছে যে নিজের স্ববিরোধিতা বুঝবার কিম্বা নিজের কথা বা কার্যকে বাস্তব যুক্তি অথবা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের নিরিখে যাচাই করার ক্ষমতা পর্যন্ত তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তার দৃঢ় ধারণা যে তার সব হুকুম তা যতই অর্থহীন অন্যায় কিম্বা পরস্পর-বিরোধী হোক না কেন, সেগুলো শুধু তার হুকুম এই গুনেই সঙ্গত ন্যায় এবং পরস্পর সুসমঞ্জস হয়ে ওঠে। পরে সে ঘটনাটির রিপোর্ট তার কাছে পেশ করা

হয়, সেই সম্পর্কে তার নির্দ্দেশ এই অর্থহীন হুকুমের পর্যায়ে পড়ে।

ঘটনাটি এই ঃ এক যুবক দুই দুই বার পরীক্ষায় ফেল করে তৃতীয়বার পরীক্ষা দিতে আসে। পরীক্ষক এবারেও তাকে পাশ করাতে রাজী হন নি। যুবকটি মাথা-পাগল ধরণের। এই সিদ্ধান্তকে অন্যায় মনে করে রাগের মাথায় টেবিল থেকে একখানা পেনসিল কাটা ছুরি নিয়ে সে পরীক্ষকের দিকে রুখে যায় এবং তার গায়ে সামান্য কয়েকটি আঘাত করে।

ছাত্রটির নাম কি ? নিকোলাস জিজ্ঞাসা করেন।

বঝেজভস্কি।

পোল ?

পোল পিতামাতার সন্তান এবং রোমান ক্যাথলিক। চার্নিশভ জানায়।

নিকোলাস ভ্রুকুটি করেন। পোলদের প্রতি বহু অন্যায় তিনি করেছেন। নিজের এই অন্যায় সমর্থনের জন্য তিনি পোলদের সবাইকে পাজি বলে গণ্য করতেন এবং এই ধারণা বদ্ধমুল ছিল বলেই যতটা ঘৃণা করতেন তদনুপাতে তাদের ক্ষতি সাধন করেছেন।

থামুন একটু! চোখ বুজে মাথা নীচু করে তিনি বলেন।

নিকোলাসের মুখে একাধিকবার একথা শুনে চার্নিশভ বুঝতে পারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সম্রাটকে কয়েক মুহূর্তের জন্য মনঃসংযোগ করতে হয় এবং কোন ঐশী শক্তি তখন

তাকে চালনা করে আর তার ফলে অপূর্ব সব সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। মনে হয়, কে যেন ভেতর থেকে তাকে ইতি-কর্তব্য বলে দিচ্ছে। ঘটনাটি তার মনে পোলদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণার উদ্রেক করেছে নিকোলাস এখন ভাবছিলেন কেমন করে পুরোপুরি তার শোধ তোলা যায়। অন্তরাত্মার আহ্বানে তিনি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত করেন। রিপোর্টটি নিয়ে তার বাঁ পাশে বড় বড় হস্তাক্ষরে তিনটি বানান ভুল করে তিনি লিখলেন : মৃত্যুই যোগ্য শাস্তি। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, প্রাণদণ্ড আমাদের নেই। আর আমি তা প্রবর্তন করতেও চাই না। হাজার লোক দিয়ে বারো বার ওকে এক একটা বাড়ি মারবার ব্যবস্থা করতে হবে —নিকোলাস।

বেশ কায়দা করেই তিনি উপাধিসহ নিজের নাম স্বাক্ষর করেন।

নিকেলোস বেশ জানেন যে রেগুলেসন লাঠির বারো হাজার বাড়ির অর্থ শুধু সুনিশ্চিত পীড়াদায়ক মৃত্যুই নয়, এ দণ্ড অনাবশ্যক পীড়ন। কারণ, শ্রেষ্ঠ বলবান ব্যক্তিকে হত্যা করার পক্ষেও পাঁচ হাজার বাড়ি যথেষ্ট। তবু এই চরম নিষ্ঠুরতা তাঁকে আনন্দ দেয় এবং সেই সঙ্গে এই ভেবেও তিনি আনন্দ পান যে রাশিয়ায় আমরা প্রাণদণ্ড তুলে দিয়েছি।

ছাত্রটি সম্পর্কে হুকুম লিখে কাগজখানা তিনি চার্নিশভের দিকে ঠেলে দেন। বলেন, এই নিন, পড়ুন।

চার্নিশভ হুকুমটি পড়ে যায় এবং সিদ্ধান্তের বিচক্ষণতার প্রতি সশ্রদ্ধ বিস্ময় প্রকাশের উদ্দেশ্যে মাথা হেঁট করে।

নিকোলাস তখন বলেন, আর হাঁ, এই শাস্তি দেবার সময় কুচকাওয়াজের ময়দানে সব ছাত্র হাজির থাকে যেন !

মনে মনে ভাবেন, তার ফল ভালই হবে ! বিদ্রোহী-ভাব আমি উচ্ছেদ করব—সমূলে উৎপাটন করে ফেলব।

নিশ্চয় তা করা হবে ! চার্নিশভ বলে ; তারপর একটু থেমে কপালের কেশগুচ্ছ সোজা করে সে ককেসাসের রিপোর্টের প্রসঙ্গে ফিরে যায়।

প্রিন্স ভরন্তসভের রিপোর্টের জবাবে আমায় কি লিখতে আজ্ঞা করেন ?

আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী চেচানিয়ার বাসগৃহ ও খাদ্য ধ্বংস করতে এবং মাঝে মাঝে হানা দিয়ে তাদের বিব্রত করতে লিখে দিন। নিকোলাস জবাব দেন।

হাজি মুরাদ সম্পর্কে মহামান্য সম্রাটের কি আদেশ হয় ? চার্নিশভ জিজ্ঞাসা করে।

কেন ভরন্তসভ তো লিখেছেন যে ককেসাসে তাকে তিনি কাজে লাগাতে চান।

সে কি বিপজ্জনক হবে না ? নিকোলাসের দৃষ্টি এড়িয়ে চার্নিশভ বলে, আমার শঙ্কা হয়, ভরন্তসভ বড্ড বেশী বিশ্বাস করছেন !

তাহলে আপনি—আপনি কি মনে করেন ? ভরন্তসভের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সম্রাটের মনে প্রতিকূল ভাব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কথাটা বলা হয়েছে একথা বুঝতে পেরে কাটাকাটাভাবে জিজ্ঞাসা করেন নিকোলাস।

আজ্ঞে, আমার ধারণা তাকে মধ্য রাশিয়ায় নিয়ে আসা নিরাপদ। নিকোলাস তখন শ্লেষ করে বলেন, আপনার ধারণা! কিন্তু আমায় ধারণা আলাদা। ভরন্তসভের সঙ্গে আমি একমত। সেই অনুসারে তাকে লিখে দিন।

অবশ্যই লেখা হবে। চার্নিশভ বলে এবং উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে চলে যায়।

দলগোরুকিও বেরিয়ে যায় অভিবাদন করে। গোটা সাক্ষাতকারের সময় সেনাবাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে নিকোলাসের প্রশ্নের জবাবে সে সামান্য গুটিকয়েক কথাই বলেছে।

চার্নিশভের পর নিকোলাস পশ্চিম প্রদেশের বড়লাট বিবিকভকে দর্শন দেন। অরথোডক্স ফেইথ (রুশিয়ার জাতীয় গীর্জার ধর্মমত) গ্রহণে অনিচ্ছুক বিদ্রোহী কৃষকদের বিরুদ্ধে বিবিকভ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তা অনুমোদন করে নিকোলাস বিদ্রোহীদের সামরিক আদালতে বিচারের আদেশ দেন। এ আদেশ সকলকে ডাণ্ডা মারার হুকুমের সামিল। এক সম্পাদককেও তিনি সাধারণ সৈনিক হিসাবে কাজ করতে পাঠাবার হুকুম দেন। তার অপরাধঃ কয়েক হাজার খাস-মহলের চাষীকে সম্রাটের জমিদারিতে কাজ করতে পাঠাবার সংবাদ সে প্রকাশ করে দিয়েছে।

নিকোলাস বলেন, সঙ্গত মনে করলাম বলেই এ আদেশ দিলাম। আমি চাই না এ নিয়ে কোন আলোচনা হোক।

বিবিকভ বুঝতে পারল যে উনিয়েত* চাষীদের সম্পর্কে নিকোলাসের আদেশ নিষ্ঠুর। এও সে জানে যে সেকালের রাশিয়ার একমাত্র স্বাধীন চাষী খাসমহলের প্রজাদের সম্রাটের জমিদারিতে পাঠান ঘোর অবিচার, কেননা তাতে আবার তাদের রাজপরিবারের ভূমিদাস করা হল। কিন্তু প্রতিবাদ করা অসম্ভব। নিকোলাসের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার অর্থ চল্লিশ বছর সেবা করে আজ সে কাম্য পদমর্যাদা ভোগ করছে তা হারান। কাজেই সাদা ছোপ-লাগা কালো মাথা হেঁট করে বিনীতভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে সে এই নিষ্ঠুর অর্থহীন অসৎ রাজাদেশ পালন করতে স্বীকৃত হয়।

বিবিকভকে বিদায় দিয়ে নিকোলাস চেয়ারে গা এলিয়ে দেন। মনে ভাবেন, সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে বেরিয়ে পড়বার বেশবাস করতে উঠে পড়েন। এপলেট, অর্ডার ও ফিতে সহ একটা উর্দি পরে তিনি অভ্যর্থনার হলঘরে প্রবেশ করেন। শতাধিক উর্দি-পরা পুরুষ এবং জমকাল কাঁধখোলা পোশাকপরা মহিলা সে ঘরে যার যার পূর্বনির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে উৎসুক আগ্রহে তার আগমনের প্রতীক্ষা করছে। নিস্প্রাণ দৃষ্টিতে বুক ফুলিয়ে আর উর্দির পট্টি বাঁধা ভুঁড়ি টান করে তিনি এদের সামনে আসেন এবং সকলেই সসম্ভ্রমে কম্পিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছে

---

* উনিয়েতরা রোমের পোপকে স্বীকার করে; যদিও অন্যান্য বিষয়ে তারা রুশো-গ্রীক অরথোডক্স চার্চের সঙ্গে একমত।

একথা অনুভব করে তার ভারিক্কি চাল আরও বেড়ে যায়। চেনা লোকের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই নামটা স্মরণ করে তিনি কখনও রুশ ভাষায় আবার কখনও বা ফরাসীতে তাদের সঙ্গে দু একটা কথা বলেন এবং নিস্তেজ টলটলে চোখে একদৃষ্টে চেয়ে তাদের বক্তব্য শোনেন।

নববর্ষের সমস্ত অভিনন্দন গ্রহণ করে তিনি গির্জায় যান। সেখানে ভগবানের সেবক পুরোহিতদের মাধ্যমে ভগবান স্বয়ং সাংসারিক লোকদের মতই নিকোলাসের সংবর্ধনা ও স্তুতি করেন এবং অভিনন্দন এবং স্তুতিবাদে ক্লান্ত নিকোলাস বিধিমতে তা গ্রহণ করেন। সব কিছুই যথারীতি নিষ্পন্ন হল; কেননা গোটা দুনিয়ার শান্তি ও মঙ্গল তার উপর নির্ভরশীল; আর ক্লান্ত হলেও বিশ্বদুনিয়াকে তিনি তার সাহায্য থেকে বঞ্চিত করবেন না।

গির্জার অনুষ্ঠানান্তে জমকাল বেশবাস এবং সযত্নে বিন্যস্ত লম্বা চুলওলা ডিকন (পাদরি) দীর্ঘজীবন কামনার প্রার্থনা গান ধরে দেয়। গির্জার বাছাই গায়কদলও সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু করে। নিকোলাস এই সময় চারিদিকে চেয়ে জানালার পাশে দাঁড়ান নেলিদোভাকে দেখতে পান এবং মনে মনে গত রাত্রের মেয়েটির সঙ্গে তুলনা করে নেলিদোভার অনুকূলেই রায় দেন।

গির্জার অনুষ্ঠানের পর সম্রাজ্ঞীর কাছে গিয়ে মিনিট কয়েক তিনি পরিবার ও সন্তান-সন্ততির সঙ্গে কাটান। তারপর হার-

মিটেজ (২) পার হয়ে তিনি রাজসভার মন্ত্রী ভলকনস্কির সঙ্গে দেখা করেন এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাকে স্পেশাল ফণ্ড থেকে গত রাত্রের মেয়েটির মাকে একটা বাৎসরিক বৃত্তি দেবার হুকুম দেন। সেখান থেকে তিনি আনুষ্ঠানিক ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

পম্পিয়ান হলে সেদিন ডিনারের আয়োজন করা হয়। নিকোলাস ও মিখায়েলের ছোট ছোট পুত্রেরা ছাড়া ব্যারন লাইভেন, কাউন্ট রাঝেভস্কি, দলগোরুকি, প্রুশিয়ার রাজদূত এবং প্রুশিয়ার রাজার পার্শ্বচরও আমন্ত্রিত হয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনে উপস্থিত ছিলেন।

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী আসবার আগে পোলাণ্ডের অস্বস্তিকর সংবাদ সম্পর্কে ব্যারন লাইভেন ও প্রুশিয়ার রাজদূতের মধ্যে এক মজার আলোচনা হয়।

লাইভেন ফরাসীতে বলেন, পোলাণ্ড আর ককেসাস রাশিয়ার দুটি বিষক্ষতের মত। দু জায়গাতেই আমাদের এক লাখ করে সৈন্য দরকার।

কথাটা শুনে রাজদূত কৃত্রিম বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করেন। ফরাসীতে বলেন, পোলাণ্ডের কথা বলছিলেন? তা বটে,

---

(২) উইন্টার প্রাসাদের সংলগ্ন পেতরবুর্গের বিখ্যাত যাদুঘর ও চিত্রের গ্যালারি।

আমাদের দুই দেশকে ঝামেলায় ফেলে মেটারনিশ (১) জবর কূটনৈতিক চাল চেলেছে।

এই সময় সম্রাজ্ঞী মাথা কাঁপাতে কাঁপাতে হাসিমুখে ঘরে ঢোকেন। নিকোলাস আসেন তার পেছু পেছু।

ডিনারের সময় হাজি মুরাদের আত্মসমর্পণের কথা প্রকাশ করে নিকোলাস বলেন যে ককেসাসের যুদ্ধ শিগগিরই ক্ষান্ত হয়ে যাবে, কেননা গাছ কেটে আর শিকলের মত কেল্লা তৈরী করে তিনি যেভাবে অভিযান চালাবার পরিকল্পনা করে দিয়েছেন তাতে পাহাড়েরা আর বেশী দিন উৎপাত করতে পারবে না।

রাজদূত সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বচরের সঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে। আজ সকালেই সে পার্শ্বচরকে বলেছে যে নিকোলাস নিজেকে মস্ত একজন রাজনৈতিক পরিকল্পনা-বিশারক বলে মনে করে। নিকোলাসের এই দুর্ভাগ্যজনক দুর্বলতা জানা থাকা সত্ত্বেও মুখে সে পরিকল্পনার প্রশংসা করে।

ডিনারের পর নিকোলাস ব্যালে-নাচের আসরে যায়। আঁটসাট যৎকিঞ্চিৎ বেশবাস সজ্জিতা শত শত রমণী তাকে ঘিরে নৃত্য করে। একটি মেয়ে বিশেষভাবে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং জার্মাণ ব্যালে-মাস্টারকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি হুকুম দেন যে তাকে একটা হীরার আংটি পুরস্কার দেওয়া হবে।

---

(১) মেটারনিশ: অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের উনবিংশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত চ্যান্সেলর।

পরদিন চার্নিশভ তার রিপোর্ট পেশ করলে ভরন্তসভ সম্পর্কে নিকোলাস পূর্ব-নির্দেশ বহাল রাখেন এবং বলেন যে হাজি মুরাদ আত্মসমর্পণ করায় চিচেনদের এখন আরও বেশী করে হয়রান করতে হবে, কঠোর করতে হবে তাদের চারিদিকের বেষ্টনী।

নিকোলাসের আদেশ অনুযায়ী সেই মাসেই (জানুয়ারি, ১৮৫২) অবিলম্বে চেচনিয়ায় এক হানার আয়োজন করা হয়।

অভিযানের জন্য পাঠান হয় চারটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন, দুই কোম্পানী কজাক সৈন্য এবং আটটি কামান। রাস্তা দিয়ে মার্চ করে চলে সৈন্যদল। উভয় পার্শ্বে একটানা লাইনে চলেছে উঁচু গোড়ালির বুট পরা ভেড়ার ছাল জড়ান মাথায় উঁচু টুপি পরা কাঁধে রাইফেল আর কোমরের বেল্টে কার্তুজবাহী জ্যাগাররা (১)। একবার উপরে উঠছে আবার নামছে।

শত্রু এলাকা দিয়ে চলবার সময় যথারীতি যতটা সম্ভব নীরবতা পালন করা হয়। খানার মধ্যে পড়ে কামানগুলো মাঝে মাঝে শুধু ঝনঝন করে ওঠে, কিম্বা নীরবতার হুকুমের তাৎপর্য উপলব্ধি না করতে পেরে কখনও বা দু একটা ঘোড়া চিঁ হি হি হি কি নাকের শব্দ করে ওঠে। আবার কখনও বা ক্রুদ্ধ কোন কমাণ্ডার চাপা খেড়ে গলায় ধমকে ওঠে যে লাইন বড্ড ছড়িয়ে পড়েছে ; কখনও বা কাছে ঘেঁষবার জন্য কিংবা

(১) জ্যাগার : রাইফেলবাহী এক ধরণের জার্মাণ সৈন্যের নাম।

বেশী দূরে সরে যাবার জন্য ধমক দেয়। অশ্বারোহীদের লাইন ও সৈন্যশ্রেণীর মাঝামাঝি একটা কাঁটা ঝোপের মধ্যে বুক সাদা একটা গাজেল হরিণী এবং তার পেছনে একই রঙের পেছন দিকে ছোট্ট শিঙ বাঁকান একটা হরিণ দেখে একবার মাত্র নীরবতা ভাঙে। সামনের পা তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে সুন্দর ভীরু প্রাণী দুটি সৈন্যশ্রেণীর এত কাছাকাছি এসে পড়ে যে সঙিন দিয়ে শিকার করার আশায় হেসে চেঁচামেচি করে সৈনিকেরা তাদের দিকে রুখে এগোয়। গাজেল দুটি অমনিই পেছন ফেরে এবং জন কয়েক অশ্বারোহী ও কোম্পানীর কুকুরগুলোর তাড়া খেয়ে জ্যাগারদের লাইনের ফাঁক দিয়ে পাখীর মত পাহাড়ের আড়ালে ছুটে পালায়।

তখন শীতকাল। সকাল বেলা রওনা হয়েছে সৈন্যদল। কিন্তু দুপুরের কাছাকাছি মাইল তিনেক এগোতেই সূর্য অনেকটা উপরে ওঠে এবং রোদের তাত এত বেড়ে যায় যে সৈনিকেরা গরম বোধ করে। সূর্যের রশ্মি এত উজ্জ্বল হয় যে সঙিনের চকচকে ইস্পাতের দিকে তাকান কষ্টকর। চোখ ধেঁধে আসে কামানের পিতলের দিকে তাকালে। ছোট ছোট সূর্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে তার উপর।

ছোট্ট খরস্রোতা একটি নদী সবে পার হল সৈনিকেরা। সামনে ঢালু উপত্যকায় চষা জমি আর মাঠ। তারও ওধারে বনঘেরা রহস্যময় পাহাড়ের চূড়া। আরও দূরে সুদূর দিগন্তের কোলে হীরকের দ্যুতিময় চির-সুন্দর চির-পরিবর্তনশীল বরফে ঢাকা পর্বতচূড়া।

পাঁচ নম্বর কোম্পানীর সামনে বাটলার নামে কাল কোট আর উঁচু টুপিপরা লম্বা সুদর্শন এক অফিসার তরোয়াল কাঁধে করে চলেছে। গার্ডদল থেকে দিন কয়েক আগে তাকে বদলী করে আনা হয়েছে। বাঁচার আনন্দ, মরণের শঙ্কা আর যুদ্ধের আগ্রহে তার মন মশগুল। একের ইচ্ছায় পরিচালিত বিরাট এক সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত হবার গর্বে সে উৎফুল্ল। এই দ্বিতীয় বার সে যুদ্ধ করতে চলেছে। মনে মনে ভাবছে: এখুনি হয়ত তাদের লক্ষ্য করে তোপ দাগা হবে; কিন্তু মাথার উপর দিয়ে গোলা উড়ে যাবার সময় সে মাথা নীচু করবে না বরং আরও উন্নত শিরে চলবে, সহাস দৃষ্টিতে তাকাবে সাথী ও সৈনিকদের দিকে এবং নিতান্ত শান্তস্বরে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করবে।

ভাল রাস্তা থেকে মোড় ফিরে সৈন্যদল ডাঁটাওলা ভুট্টা ক্ষেত্রের মধ্যে অল্পব্যবহৃত পথে পড়ে। বনের কাছাকাছি আসতেই বিপদ সংকেতের মত শিশ্ দিয়ে একটা গোলা তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে রাস্তার পাশে মাঠের মধ্যে ফাটে। কেউ বুঝল না কোত্থেকে এল গোলাটা।

এই শুরু হল! হাস্যোজ্জ্বল মুখে পাশের এক সাথীর দিকে চেয়ে সোৎসাহে বলে ওঠে বাটলার।

সত্যিই এই শুরু। গোলাটির পরে পতাকাসহ মস্ত একদল অশ্বারোহী চিচেন বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। জনতার মধ্যে মস্ত বড় একটা নীল পতাকা দেখা যায়। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন

বৃদ্ধ এক সার্জেন্ট-মেজর ক্ষীণদৃষ্টি বাটলারকে বলে সে স্বয়ং শামিল রয়েছে এ দলে। দলটি পাহাড় বেয়ে নামে এবং সৈন্যদলটির সন্নিকটে উপত্যকার সর্বোচ্চ অংশে দেখা দিয়ে আবার নামতে থাকে।

পুরু কালো কোট আর উঁচু টুপি পরা বেঁটে এক জেনারেল ঘোড়া ছুটিয়ে বাটলারের কাছে এসে ডান দিকে গিয়ে তাদের আগুয়ান শত্রুকে আক্রমণ করতে বলে। বাটলার অমনিই নির্দেশ অনুযায়ী কোম্পানী নিয়ে রওনা হয়; কিন্তু উপত্যকায় পৌঁছাবার আগেই সে পেছনে দুটো তোপদাগার আওয়াজ শোনে। পেছন ফিরে দেখেঃ পিঙ্গল ধোঁয়ার দুখানি মেঘ কামানের মুখ থেকে বেরিয়ে উপত্যকার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। গোলন্দাজ দলের সম্মুখীন হবার কল্পনা পাহাড়ে অশ্বারোহীরা করেনি; কাজেই তারা হটে যায়। বাটলারের কোম্পানী তখন তাদের তাক করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। গোটা দরি ভরে যায় বারুদের ধোঁয়ায়। দরির খানিকটা উপরে শুধু দ্রুত পলায়নপর পাহাড়েদের দেখা যাচ্ছে। পেছু হটবার সময়েও অনুসারী কজাকদের লক্ষ্য করে তারা গুলি করেছে। কোম্পানী আরও খানিকটা দূর পাহাড়েদের ধাওয়া করে এবং দ্বিতীয় দরির ঢালু থেকে একটা আউল নজরে পড়ে।

কজাকদের অনুসরণ করে বাটলার ও তার সঙ্গীরা কদমে ছুটে আউলে ঢোকে। কিন্তু বস্তি জনশূন্য। শস্য খড় এবং সাকলায় আগুন ধরিয়ে দেবার জন্য তখন সৈনিকদের উপর হুকুম

হয় এবং অনতিবিলম্বেই গোটা আউল ধোঁয়ার তীব্র গন্ধে ভরে যায়, আর সৈনিকেরা সেই সুযোগে ছুটাছুটি করে সাকলা থেকে যা পারে হাতড়ে নেয়। মোরগ নিয়ে যাবার সময় পাহাড়েরা পায়নি। সেই দিকেই সৈনিকদের বেশী নজর যায়।

ধোঁয়ার বাইরে খানিকটা দূরে বসে অফিসাররা লাঞ্চ খায় আর মদ্য পান করে। একখানা বোর্ডে করে সার্জেন্ট-মেজর তাদের খানিকটা মৌচাক এনে দেয়। চিচেনদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না; তাই বিকেলের দিকে পেছু হটবার হুকুম দেওয়া হয়। আউলের পেছনে গোটা কোম্পানী সার বেঁধে দাঁড়ায়। বাটলার ছিল পেছনে। তারা রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে চিচেনরা আবার দেখা দেয় এবং তাদের অনুসরণ করে গুলি চালাতে থাকে। কিন্তু সৈন্যদলটি একটা খোলা যায়গায় আসতেই তারা গুলি বন্ধ করে।

বাটলারের কোম্পানীর কেউ আহত হয়নি। খোসমেজাজে উৎফুল্লভাবেই সে ফিরে আসে। সকাল বেলা যে নদীটি পার হয়েছিল আবার সেটি পার হয়ে সৈনিকেরা ভুট্টা ক্ষেত্রের মধ্যে ও মাঠে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন কোম্পানীর গায়কদল (১) এগিয়ে আসে। বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে গানে ঃ

জ্যাগাররা আলাদা, আলাদা জ্যাগররা !

বাটলারের কোম্পানীর লোমশ কটা কুকুর ত্রেজোরকা লেজ পাকিয়ে সামনে দৌড়ে যায়; ভাব দেখে মনে হয় কমাণ্ডারের

(১) প্রতিটি কোম্পানীর সঙ্গে গায়কদল থাকত।

দায়িত্ব বুঝি তারই। বাটলার নিজে বেশ হৃষ্ট শান্ত আর উৎফুল্ল। তার কাছে যুদ্ধের অর্থ বিপদ ও সম্ভাব্য মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া এবং সেই ঝক্কির বিনিময়ে পুরস্কার লাভ আর এখানকার সাথী এবং রাশিয়ার বন্ধুদের শ্রদ্ধা পাওয়া। ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে, তার কল্পনায় যুদ্ধের বিপরীত রূপ কোনদিন স্থান পায়নি। কোনদিন সে ভাবেনি সৈনিক অফিসার কিংবা পাহাড়েদের হতাহত হবার কথা। সেই কাব্যিক কল্পনা অটুট রাখবার জন্য ইচ্ছে করে সে হতাহতদের দিকে ফিরে চায় না। সেদিনকার যুদ্ধে এ পক্ষের তিন জন নিহত এবং চার জন আহত হয়। চিৎ হয়ে শোওয়া একটি শবের পাশ দিয়ে যাবার বেলা সে দেখবার জন্য থেমে দাঁড়াল না। চলতে চলতে এক চোখ দিয়ে দেখে গেল লাশটির মোমের মত সাদা হাতের অদ্ভুত ভঙ্গ। আর তার মাথার গাঢ় লাল চিহ্নটি। পাহাড়েরা তার দৃষ্টিতে শুধু অশ্বারোহী দ্জিগিত, তাদের সামনে আত্মরক্ষা করাই একমাত্র কাজ।

দুটো গানের মাঝখানে তার মেজর বলে, বুঝলে ভায়া, এ তোমাদের পেতরবুর্গ নয়! ডাইনে-বাঁয়ে চোখ রেখে চলবে! যাক, এখানকার কাজ তো শেষ হল। এখন সরাসরি বাসায় যাব। সঙ্গে সঙ্গে মাশা মাংসের সিঙ্গারা আর রসাল বাঁধাকপির ঝোল নিয়ে আসবে। এই তো জীবন! কেমন তাই না হে! ওহে, 'তখন হয়ে এল ভোর' গানটা ধরতো! নিজের প্রিয় গানটি গাইবার হুকুম করে মেজর।

হাওয়া নেই। আবহাওয়া পরিষ্কার ঝরঝরে। এই নির্মল আবহাওয়ায় প্রায় শতেক মাইল দূরের বরফ ঢাকা পাহাড়ও খুব কাছের বলে মনে হয়। প্রতিটি গানের শেষে পদ-শব্দ আর কামানের ঢং ঢং আওয়াজ আবহ সঙ্গীতের মত লাগে। বাট-লারের কোম্পানী যে গানটি গাইছে, রেজিমেণ্টের সম্মানার্থে সেটি রচনা করেছে এক অফিসার। সুর সংযোজনা করা হয়েছে নাচের উপযোগী করে। কোরাস হচ্ছে ঃ জ্যাগাররা আলদা—আলাদা জ্যাগাররা!

বাটলারের ঘোড়ার পাশাপাশি চলেছে তার উপরওলা অফিসার মেজর পেত্রভ। একসঙ্গেই থাকে তারা। গার্ডদল ছেড়ে ককেসাসে এসে প্রথমে বাটলার খুব খুশি হতে পারেনি। এখানে বদলী হবার প্রধান কারণ ঃ তাস খেলায় সে সর্বস্ব হেরে যায়। তখন শঙ্কা হল যে সেখানে থাকলে তাস খেলার নেশা সে ছাড়তে পারবে না, যদিও আর হারবার মত কিছুই তার ছিল না। সে সব দিন কেটে গেছে। এখন সে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। সাহসিকতাভরা মধুময় আনন্দের জীবন! আজ সে ভুলে গেছে যে একদিন সে ডুবে গিয়েছিল, ভুলে গেছে তার দেনার কথা। ককেসাসের পরিবেশ, যুদ্ধ, সৈনিক, অফিসার—এই নেশাখোর সাহসী সদাশয় লোকগুলোর সঙ্গ এবং স্বয়ং মেজর পেত্রভের সাহচর্য আজকে বড় মধুর লাগে। মাঝে মাঝে মনে হয়, পেতরবুর্গে না থেকে ভালই করেছে। তামাকের ধোঁয়া ভরা ঘরে বসে জুয়া খেলা, তাসের কোন ভাঙা, ভাল তাস যে

পায় তাকে ঘৃণা করা আর ভারী মাথার যন্ত্রণা ভোগ করার চাইতে ঢের ঢের ভাল সাহসী ককেসীয়দের সঙ্গে এই রমনীয় অঞ্চলে বাস করা।

মেজর এবং এক ডাক্তারের আরদালির মেয়ে ইদানীং স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করছে। মেয়েটির আগের নাম ছিল মাশা; কিন্তু আজকাল তাকে খানিকটা ভদ্রস্থ নামে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা বলে ডাকা হয়। মারিয়া সুকেশী, শোভনা। মুখে মেচতা-পড়া। বয়স ত্রিশ বছর—নিঃসন্তান। অতীত জীবন যাই হোক, আজকে সে মেজরের বিশ্বস্ত সঙ্গিনী, আর নার্সের মত তার দেখাশোনা করে। তার প্রয়োজনও আছে, কারণ মেজর হামেশাই বেহেড মাতাল হয়ে পড়েন।

কেল্লায় পৌঁছোবার পর মেজরের অনুমান অনুযায়ীই সব কিছু ঘটে। মেজর, বাটলার এবং দলের আর দুটি নিমন্ত্রিত অফিসারকে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা বেশ পুষ্টিকর সুস্বাদু খাবার এনে দেয়। মেজর এমনভাবে খান এবং মদ্যপান করেন যে শেষ অবধি কথা বলবার শক্তি থাকে না। তারপর তিনি ঘুমোতে চলে যান।

বাটলারও চিকির মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে এবং ক্লান্ত তবু প্রসন্নমনে শোবার ঘরে যায়। বেশবাস খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই হাতের উপর সুদর্শন কোঁকড়ান মাথা রেখে গভীর স্বপ্নহীন একটানা ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

যে আউলটি ধ্বংস করা হয়, রুশপক্ষে আসবার আগের দিন সেখানে রাত্রিবাস করেছে হাজি মুরাদ। রুশ সৈন্যদল আসতে দেখেই সপরিবারে সাদো আউল ছেড়ে যায়। ফিরে এসে দেখে সাকলা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, আর চাল ভেঙে পড়েছে, বৈঠকখানার কপাট ও খুঁটি পোড়া। ঘরময় নোংরা। তার যে প্রিয়দর্শন ছেলেটি অমন উৎফুল্ল দৃষ্টিতে হাজি মুরাদের দিকে চেয়েছিল, বোরকা ঢাকা অবস্থায় ঘোড়ায় করে তার মৃতদেহ মসজিদে নিয়ে আসা হয়। রাসভারী যে মহিলাটি অতিথি হাজি মুরাদকে খাবার দিয়েছিল, আজকে সে পুত্রের মৃতদেহের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তার সেমিজের সামনের দিক ছেঁড়া, শুটকো স্তনদ্বয় অবারিত, চুল আলুথালু। নখ দিয়ে এমনভাবে সে মুখ খামচে ধরেছে যে রক্ত ঝরছে। অনবরত আর্তনাদ করছে মহিলাটি। খন্তা কোদাল নিয়ে আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সাদো গেছে পুত্রের কবর খুঁড়তে। পিতামহ বসে আছে পোড়া সাকলার দেয়ালে হেলান দিয়ে। একখানা ছড়ি কাটছে আর শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সামনের দিকে। মৌমাছি পোষার ঘর থেকে সবে ফিরেছে বৃদ্ধ। সেখান দুটো খড়ের পাঁজা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শেরি এবং খুবানীর যে চারাকটি বৃদ্ধ পুঁতেছিল এবং সযত্নে এতদিন পালন করেছে, তার সবকটি ভেঙে আগুনের তাতে ঝলসে গেছে। সব চেয়ে দুঃখের কথা, মৌচাক আর মৌমাছিগুলোও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্ত্রীলোক ও শিশুদের কান্নার সঙ্গে মিশেছে ক্ষুধার্ত

গরু বাছুরের হাম্বা রব। গরুর খাবারও পুড়ে গেছে। কিশোররা খেলা ছেড়ে ভয়চকিত দৃষ্টিতে বড়দের পেছু পেছু চলছে। জল যাতে ব্যবহার করা না যায় সেজন্য ইচ্ছে করে ঝর্ণার জল নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। মসজিদও ঠিক একইভাবে অপবিত্র করা হয়েছে। মোল্লা এবং তার সহকারীরা সেটি পরিচ্ছন্ন করছে। কেউই রুশদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছে না। আবাল বৃদ্ধ সমস্ত চিচেনের মনোভাব ঘৃণার চাইতেও প্রবল। ঘৃণা তারা করছে না, কারণ এই রুশ কুকুরগুলোকে তারা মানুষ বলেই গণ্য করে না। কিন্তু এদের আচরণ তাদের মনে এমন জিঘাংসা এমন বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে যে ইঁদুর, বিষাক্ত মাকড়সা কিম্বা নেকড়ের মত এদের নির্মূল করা আত্মরক্ষার মতোই স্বাভাবিক বৃত্তি বলে মনে হয়েছে।

আউলের অধিবাসীদের সম্মুখে তখন দুটি পথ খোলা। হয় ক্রোধ ও ঘৃণা চেপে বিধর্মী রুশদের কাছে নতিস্বীকার করতে হবে; আর না হয় এই গাঁয়েই থাকতে হবে, আবার প্রচণ্ড শ্রম করে গড়ে তুলতে হবে তাদের এতদিনকার শ্রমার্জ্জিত ঘর সংসার তুচ্ছজ্ঞানে রুশরা যা অবজ্ঞাভরে ধ্বংস করেছে এবং প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকতে হবে এমনি ঘটনার পুনরাবৃত্তির জন্য। প্রবীনেরা প্রার্থনা করেন এবং সমবেতভাবে সর্বসম্মতি ক্রমে শামিলের সাহায্যলাভের জন্য দূত পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেন। তারপর কালবিলম্ব না করে তারা ঘর-দোর পুন-নির্মানের কাজে লেগে যায়।

হানার পরদিন সকালে ঘরের পেছনের বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাটলার। খুব যে প্রত্যুষে বেরিয়েছে এমন নয়। ইচ্ছা, পেত্রভের সঙ্গে প্রাতরাশ খাবার আগে ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় খানিকটা বেড়িয়ে আসবে। সূর্য ইতিমধ্যেই পাহাড়ের চূড়া ছাড়িয়ে উঠেছে। রাস্তার ডানপাশের ঘর বাড়ীর সাদা দেয়ালের দিকে তাকালে চোখ ধেঁধে যায়। কিন্তু বাঁ দিকের দূরপ্রসারী ক্রমোন্নত বনে-ঢাকা পাহাড় আর মেঘ বলে ভ্রম হয় এমনি বহু দূরের ক্ষীণ বরফ ঢাকা গিরিচূড়ার মনোরম ছবির দিকে চাইলে ববাবরই চোখ জুড়োয়। অপলক দৃষ্টিতে বাটলার চেয়ে থাকে এই স্নিগ্ধ শোভার দিকে। জোরে জোরে শ্বাস টানে আর বেঁচে থাকার আনন্দে, শুধু এই চোখ জুড়ান পরিমণ্ডলের মধ্যে বেঁচে থাকার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

গতকাল এগুবার সময়, বিশেষ করে বিপজ্জনক পিছোবার সময় তার হালচালের কোন ত্রুটি হয়নি বলে মনটা আরও খুশি আছে। হানদারি থেকে ফিরে আসার পরেই পেত্রভের রক্ষিতা মাশা যেভাবে তাদের খাবার-দাবার দিয়েছে সে কথা ভেবেও মনটা ভাল লাগছে। সবাইর সঙ্গেই বিশেষ অমায়িক সরল ব্যবহার করেছে মাশা বা মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা। বাটলারের ধারণা, তার প্রতি যেন একটু বেশী সদয়।

স্বাস্থ্যবান অবিবাহিত যুবক বাটলার। দিমিত্রিয়েভনার মোটা বেণী, প্রশস্ত কাঁধ, উন্নত স্তনযুগ আর হাসিভরা মুখ যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাটলারকে আকর্ষণ করে। মাঝে মাঝে তার

এমনও মনে হয়েছে যেন মেয়েটি তাকে চাইছে। কিন্তু এ প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে সরল সদাশয় সাথীর প্রতি অন্যায় করা হবে বলেই তার ধারণা। তাই মাশার প্রতি বরাবর সে সরল সশ্রদ্ধ মনোভাব বজায় রেখেছে এবং সেজন্য মনে মনে সে খুশি।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটছে বাটলার। সহসা সামনের ধূলো ওড়া পথে একসঙ্গে অনেক অশ্বখুড়ের শব্দে তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে। মনে হয় একসঙ্গে অনেক লোক ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। মুখ তুলে চেয়ে দেখে, রাস্তার শেষ প্রান্তে একদল অশ্বারোহী হেঁটে হেঁটে আসছে তার দিকে। জন কুড়ি কজাকের সামনে দুটি সওয়ার। একজনের গায়ে সিরকাজীর কুর্তা আর মাথায় উঁচু পাগড়ি। অপর জন রুশ সেনাদলের এক অফিসার, ময়লা রঙ, ঈগলের মত নাক, পিঙ্গল উর্দিতে আর হাতিয়ারে প্রচুর রূপা। পাগড়িপরা লোকটির ঘোড়ার রঙ পিঙ্গল—কেশর ও লেজের লোম আরও ফিকে, মাথা ছোট, চোখ সুন্দর। আর অফিসারের বাহনটি মস্ত বড় সুদর্শন কারাবাখ ঘোড়া। ঘোড়া-প্রিয় বাটলার সঙ্গে সঙ্গে পিঙ্গল ঘোড়াটির শক্তিমত্তা বুঝতে পারে এবং আগন্তুকদের পরিচয় জানবার জন্য দাঁড়ায়।

অফিসার তাকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করে, এইটাই কি সেনাধ্যক্ষের বাড়ী? তার পরদেশী উচ্চারণ ভঙ্গীতেই ধরা পড়ে যে লোকটা বিদেশী।

বাটলার সায় দেয়। তারপর অফিসারটির কাছে এসে পাগড়িপরা লোকটির দিকে ইঙ্গিত করে বলে, ঐ লোকটি কে ?

হাজি মুরাদ। কমাণ্ডারের এখানে থাকবে বলে এসেছে। অফিসার বলে।

হাজি মুরাদের নাম শুনেছে বাটলার। তার রুশ পক্ষে আসার কথাও জানে। কিন্তু এই ছোট্ট কেল্লায় দেখবে বলে কোনদিনই আশা করেনি। হাজি মুরাদ হৃষ্ট চোখে তার দিকে তাকায়।

শুভদিন, কোত্‌কিলদাই ! বাটলার বলে। এই তাতার সম্ভাষণটি সে শিখেছে।

সাউবুল। (মঙ্গল হোক) মাথা নেড়ে বলে হাজি মুরাদ। বাটলারের কাছে এগিয়ে এসে সে হাত বাড়িয়ে দেয়। দুটো আঙুলে ঝুলছে চাবুকটা।

হাজি মুরাদ জিজ্ঞাসা করে, আপনিই কি সেনাধ্যক্ষ ?

না। তিনি ভেতরে আছেন, তাকে ডেকে আনছি। অফিসারকে বলে বাটলার। সিড়ি বেয়ে উঠে সে কপাটে ঠেলা দেয়। কিন্তু মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা যাকে অতিথিদের প্রবেশদ্বার নাম দিয়েছে, তার কপাটে খিল দেওয়া। ধাক্কা দেবার পরও দরজা খুলল না দেখে বাটলার ঘুরে পেছনের দরজায় গিয়ে আরদালিকে ডাকে। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। দুটোর একটা আরদালিকেও না পেয়ে বাটলার রান্না ঘরে যায়। মাথায় রুমাল বেঁধে, গোলগাল সাদা হাতের কনুই অবধি হাতা

গুটিয়ে প্যাসট্রি ভাঁজছে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা আর 'পাই' বানাবার জন্য কুচি কুচি করে সেগুলো কাটছে। বাটলারকে দেখে তার গাল রাঙা হয়ে ওঠে।

আরদালিরা গেল কোথায়? বাটলার জিজ্ঞাসা করে।

মদ খেতে গেছে। মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা বলে।—কেন, কি চাই আপনার?

সামনের দরজাটা খুলতে হবে। দরজার সামনে এক দঙ্গল পাহাড়ে এসে হাজির হয়েছে। হাজি মুরাদও আছে।

আর নতুন কিছু আবিস্কার করতে পারলেন না! হেসে বলে মারিয়া।

আরে, পরিহাস করছি না; সত্যিই বারান্দায় অপেক্ষা করছে!

সত্যি বলছেন?

মিথ্যে কথা বলতে যাব কেন? গিয়ে দেখে এস না, ঠিক বারান্দাতেই আছে।

আজ তাহলে ভারি মজা হতো তো! হাত নামিয়ে দিয়ে এবং চুলের কাঁটা ঠিকঠাক মত আছে কিনা দেখে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা বলে।—যাই তাহলে ইভান মাতভেইচকে ডেকে তুলি গে।

না, আমি যাচ্ছি! বনদারেঙ্কো, সামনের দরজাটা খুলে দেগে।

পেত্রভের আরদালিকে দেখে বলে বাটলার।

বেশ, যা বলেন! এই কথা বলে আবার কাজে হাত দেয় মারিয়া।

হাজি মুরাদ আসবার কথা শুনে মেজর ইভান মাতভেইচ পেত্রভ বিন্দুমাত্র বিস্মিত হল না। গ্রজনিতে তার উপস্থিতির কথা ইতিপূর্বেই সে জেনেছে। বিছানায় বসে বসে সে একটা সিগ্রেট পাকায় এবং সেটা ধরিয়ে বেশবাস পরতে শুরু করে। জোরসে গলা খাকারি দিয়ে 'শয়তানটা'কে এখানে পাঠাবার জন্য সে কর্তৃপক্ষকে গালিগালাচ করে।

প্রস্তুত হয়ে সে আরদালিকে ওষুধ আনবার হুকুম দেয়। আরদালি জানে ওষুধ মানে ভোদকা, কাজেই চটপট খানিকটা এনে দেয়।

ভোদকাটুকু গলাধঃকরণ করে এবং এক টুকরো রাইর রুটি মুখে দিয়ে অস্পষ্ট ভাবে মেজর বলে, মেশাল মাল ভারি বিচ্ছিরি। কাল একটুখানি চিখির খেয়েছিলাম—এখনও মাথা ধরে আছে! হাঁ, আমি প্রস্তুত!

এই কথা বলেই সে বসবার ঘরে যায়। বাটলার ইতিমধ্যেই হাজি মুরাদ এবং তার সঙ্গী অফিসারটিকে সে-ঘরে বসিয়েছে।

অফিসারটি মেজরের হাতে বাম পার্শ্বের কমাণ্ডারের হুকুম-নামা দেয়। তাতে বলা হয়েছে যে, থাকবার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে এবং গুপ্তচর মারফত পাহাড়েদের সঙ্গে তাকে যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধা দিতে হবে কিন্তু কোন অবস্থায় উপযুক্ত কজাক প্রহরী ছাড়া বাইরে যেতে দেওয়া চলবে না।

হুকুমনামা পড়ে মেজর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হাজি মুরাদের দিকে তাকায়; তারপর আবার কাগজখানা খুঁটিয়ে পড়ে দেখে। বার কয়েক এই ভাবে কাগজখানার উপর চোখ বুলিয়ে শেষ অবধি স্থির দৃষ্টিতে হাজি মুরাদের দিকে চেয়ে বলে, ইয়কসি, বেক, ইয়কসি! (ভাল, স্যর, ভাল!)। আচ্ছা এখানে থাক। কিন্তু বলে দাও যে ওকে বাইরে যেতে দেবার হুকুম আমার উপর নেই। হুকুম পালন করতেই হবে। আচ্ছা বাটলার, ওকে কোথায় থাকতে দিলে ভাল হয় বলতো! অফিস ঘরে থাকতে দেব?

মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা ইতিমধ্যে রান্নাঘর থেকে এসে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। বাটলার জবাব দেবার আগেই সে বলে ওঠে, কেন, এইখানেই থাকতে দিন না। অতিথিশালা আর ভাঁড়ার ঘরটা আমরা ছেড়ে দেব। আর যাই হোক, তাহলে চোখে চোখে থাকবে তো!

হাসিমুখে হাজি মুরাদের দিকে চায় মারিয়া; কিন্তু তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বাটলার বলে, আমার মতে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা ভাল কথাই বলছে।

হয়েছে, হয়েছে! যাও, মেয়েদের এখানে কোন দরকার নেই। ভ্রুকুটি করে বলে মেজর।

এই আলোচনার সময় ঠোঁটে অবজ্ঞার হাসি রেখা টেনে ছোড়ার বাঁটে হাত দিয়ে বসেছিল হাজি মুরাদ। সে বলে,

যেখানেই থাকতে দেওয়া হোক তার কাছে সবই সমান। এবং সর্দার যে অনুমতি দিয়েছে, অর্থাৎ পাহাড়েদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ ছাড়া আর কিছুই সে চায় না। তারা যাতে আসা-যাওয়া করতে পারে এমন সুযোগ যেন দেওয়া হয়।

মেজর আশ্বাস দেয়ঃ সে সুযোগ মিলবে। খাওয়া-দাওয়া এবং থাকবার ঘরের বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত অতিথিদের সঙ্গে বাটলারকে গল্প-সল্প করবার অনুরোধ করে মেজর অফিস ঘরে চলে যায় লেখালেখি এবং আদেশপত্র দেবার কাজ করতে।

নব-পরিচিতদের সঙ্গে হাজি মুরাদের সম্পর্ক প্রথমাবধি সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। মেজরের উপর প্রথম থেকেই সে একটা বিরক্তি ও ঘৃণার ভাব পোষণ করতে থাকে এবং বরাবর তার সঙ্গে উদ্ধত আচরণ করে। মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা তাকে খাবার দাবার তৈরী করে পরিবেশন করত। মারিয়াকে তার বিশেষ ভাল লাগে। তার সরলতা, হাজি মুরাদের চোখে মারিয়ার বিদেশী রূপ তার ভাল লেগেছে এবং তার প্রতি মেয়েটির আকর্ষণ অলক্ষ্যে তাকেও প্রভাবিত করেছে বুঝি। তার দিকে না তাকাবার এবং তার সঙ্গে কথা না বলবার চেষ্টা করেছে হাজি মুরাদ। তবু চোখ দুটো যেন আপনা থেকে তার দিকে ফিরে গেছে, তার অনুসরণ করেছে। প্রথম পরিচয় থেকে বাটলারের সঙ্গে সে দোস্তী করেছে। স্বেচ্ছায় অনেক কথা বলেছে তাকে। জিজ্ঞাসা করেছে তার জীবনের কথা, আবার নিজেরটাও বলেছে। নিজের পরিবার সম্পর্কে গুপ্তচরেরা যে সব সংবাদ নিয়ে আসত

তাও বলত বাটলারকে এবং ইতি-কর্তব্য সম্পর্কে তার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করত।

গুপ্তচরদের মারফতে যে সংবাদ সে পেল তা মোটেই সুখবর নয়। এখানে আসবার চার দিনের মধ্যে দু'বার গুপ্তচরেরা তাকে সংবাদ দিয়ে যায় এবং দু' বারকার খবরই খারাপ।

হাজি মুরাদ রুশ পক্ষে চলে আসবার পর তার পরিবারকে ভেদেনো পাঠান হয় এবং শামিলের আদেশ না আসা অবধি কড়া পাহারায় রাখা হয়। মেয়েদের অর্থাৎ হাজি মুরাদের মা পতি মত আর পাঁচটি সন্তানসহ তার দুই স্ত্রীকে অফিসার ইব্রাহিম রসিদের সাকলায় আটকে রাখা হয়; আর হাজি মুরাদের আঠারো বছরের ছেলে ইউসুফকে পাঠান হয় কারাগারে। তার মানে আর সাত জন অপরাধীর সঙ্গে ফুট সাতেক গভীর এক গর্তে। অন্যান্য আসামীরাও নিজেদের ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা করছে।

শামিল নিজে রুশদের বিরুদ্ধে অভিযানে গেছেন বলে রায় দিতে বিলম্ব হচ্ছে।

একটা খণ্ডযুদ্ধের পর ১৮৫২ সালের ৬ই জানুয়ারি শামিল ভেদেনোয় ফিরে আসে। রুশভাষ্য অনুযায়ী পরাজিত হয়ে সে ভেদেনো পালিয়ে গেছে। কিন্তু শামিলের নিজের এবং তার সমস্ত মুরিদের বিচারে তারা জয়লাভ করেছে এবং রুশদের প্রতিরোধ করেছে। এই যুদ্ধে শামিল নিজেই রাইফেল চালায়

এবং মুরিদরা বাধা না দিলে তলোয়ার নিয়ে সরাসরি রুশদের আক্রমণ করত। নিজে সে কদাচিৎ রাইফেল চালাত। তার পাশাপাশি দুটি লোক রণক্ষেত্রেই নিহত হয়।

দুপুরবেলা শামিল বাসভবনে ফিরে আসে। একদল মুরিদ তাকে ঘিরে রাইফেল ও পিস্তলের গুলি করতে করতে 'লা ইল্লা ইল্ আল্লা' ধ্বনি করে তার সঙ্গে আসে।

নায়েবের সংবর্ধনার জন্য বিরাট আউলের সমস্ত বাসিন্দা রাস্তায় ও ঘরের চালে বেরিয়ে আসে। বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ তারাও রাইফেল ও পিস্তলের গুলি ছোঁড়ে। সাদা আরবী ঘোড়ায় চড়ে আসছে শামিল। বাড়ীর কাছাকাছি এসে ঘোড়াটি আস্তে চলে। সোনা বা রূপার কোন অঙ্গসজ্জা নেই ঘোড়াটির। সাজসজ্জা অতি সাধারণ। লাগামটা সূক্ষ্ম কাজ করা লাল চামড়ার, মাঝামাঝি জায়গায় একটা ডোরা। ধাতুনির্মিত রেকাব বাটির মত। জিনের তলার লাল চাদরখানা সামান্যই দেখা যায়। ইমামের গায়ে সূতির বাদামি আলখাল্লা। গলা ও হাতায় সরু কালো ফারের পট্টি। আলখাল্লাটা লম্বা সরু কোমরের কাছে আঁটসাট ভাবে কাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। সেই ফিতেয় ছোরা ঝুলান। তার মাথায় উঁচু পাগড়ি—ঝুরি লাগান চ্যাপটা কুল্লার চারপাশে সাদা পাগ জড়ান। পাগের একপ্রান্ত কাঁধ অবধি ঝুলে পড়েছে। পায়ে সবুজ চটি আর সাধারণ সূতো দিয়ে বাঁধা কালো পট্টি।

ঝকঝকে কোন কিছু, সোনা বা রূপোর তৈরী কোন জিনিস

নেই শামিলের সাজসজ্জায়। সোনা ও রূপোর মিনে করা পোশাক ও হাতিয়ারপরা মুরিদদের মধ্যে অলংকারহীন পোশাকপরা তার লম্বা টান শক্তিশালী চেহারা জনসাধারণের মনে ইপ্সিত প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাব সৃষ্টি করছে। ভাল করেই সে জানে কেমন করে এ প্রভাব সৃষ্টি করতে হয়! পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত স্থির অচঞ্চল তার ছোট করে কাটা লালচে দাড়িওলা পাংশুটে মুখ আর কোঁচকান চোখ। আউলের মধ্য দিয়ে চলবার সময় সে বেশ অনুভব করছে যে সহস্র চোখ তার দিকে নিবদ্ধ; কিন্তু নিজে সে চাইছে না কারও দিকে।

সাকলার অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে হাজি মুরাদের দুই স্ত্রীও বৈঠকখানায় এসেছে ইমামের আগমন দেখবার জন্য। শুধু হাজি মুরাদের বৃদ্ধা মা পতিমত আসেনি। পাকা চুল এলিয়ে লম্বা দুই হাতে শীর্ণ হাঁটু জড়িয়ে ধরে মেজেয় বসে বুড়ী তীক্ষ্ণ কালো চোখে অগ্নিকুণ্ডের নিভু নিভু আঙারের দিকে চেয়ে আছে। পুত্রের মত সেও বরাবর শামিলকে ঘৃণা করে। এখন করে আরও বেশী, কাজেই তার মুখদর্শনের ইচ্ছাও নেই। হাজি মুরাদের পুত্রও শামিলের এই বিজয়ীর মত গ্রামে প্রবেশ দেখতে পেল না। অন্ধকার তীব্র পুতিগন্ধময় গহ্বরে বসে সে শুধু রাইফেল ও পিস্তলের আওয়াজ শুনেছে আর অন্তর্দাহে জ্বলে মরেছে। প্রাণ-প্রাচুর্যেভরা স্বাধীনতা বঞ্চিত যুবকেরাই শুধু তার মর্মপীড়া বুঝতে পারে। সে শুধু দেখছে পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট তার ক্রুদ্ধ হতভাগ্য নোংরা অবসন্ন সহ-বন্দীদের।

মুক্ত আলো বাতাসে স্বাধীন ভাবে আজকে যারা তেজীয়ান ঘোড়ায় চড়ে সর্দারের চারপাশে 'লায়া ইল্লা ইল আল্লা' বলে সোল্লাসে নৃত্য করছে, সেই ভাগ্যবানদের সে হিংসে করে।

আউল পার হয়ে নিজের অন্দরমহল সংলগ্ন চত্বরে প্রবেশ করে সামিল। বাইরের খোলা ফটকের সামনে দুটি লেশা-ঘিয়ান তাকে সংবর্ধনা করে। সে ফটকেও জনতার ভীড়। কেউ কেউ বহুদূর থেকে এসেছে নিজস্ব ব্যাপারের ফয়শালা করতে, কেউ এসেছে দরখাস্ত নিয়ে, আবার কোন কোন লোককে শামিল সমন পাঠিয়েছে বিচার করে শাস্তি দেবার জন্য। ইমামকে আসতে দেখে তারা বুকে হাত ঠেকিয়ে শ্রদ্ধাভরে সালাম করে। কেউ কেউ হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে এবং শামিল বাইরের ফটক থেকে অন্ধরমহলের ফটক অবধি না যাওয়া পর্যন্ত ঐভাবেই থাকে। ভীড়ের মধ্যে বহু বিরক্তিকর লোকের মুখ এবং অনুগ্রহপ্রার্থী বহু অক্লান্ত দরখাস্তকারীকে নজরে পড়ে। কিন্তু তেমনি অনড় পাথুরে মুখভঙ্গী করেই শামিল তাদের সবাইর পাশ দিয়ে চলে যায় এবং নিজের কক্ষের লাগোয়া বৈঠকখানার সামনে ফটকের বাঁ পাশে ঘোড়া থেকে নামে। যতটা শারীরিক তার চাইতে বেশী মানসিক ক্লান্ত শামিল। লোকে তাকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করলেও সে জানে যে তার অভিযান ব্যর্থ হয়েছে, বহু চিচেন আউল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, অস্থিরমতি বহু চিচেন ইতস্তত করেছে এবং সীমান্ত রেখার কাছাকাছি চিচেনরা রুশ পক্ষে যাবার জন্য তৈরী ছিল।

এই সব কিছু বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। চিন্তার চাপে মাথা ভারী হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন সে কোন কিছুই ভাবতে চাইছে না। এখন তার একমাত্র কামনা বিশ্রাম, পারিবারিক জীবনের আনন্দ আর তার প্রিয় স্ত্রী কালোচোখ ত্বরিতগামিনী অষ্টাদশী আমিনলের আদর। সে এখন চিকের ওপাশেই আছে। শামিলের দৃঢ় বিশ্বাস যে হারেম ও বাইরের মহলের মাঝখানেকার বেড়ার ওপাশ থেকে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আমিনলও উঁকি মেরে আছে। কিন্তু তার কাছে যাওয়া এখন অসম্ভব, এমন কি অবসাদ কাটাবার জন্য পালকের গদির উপর গা এলিয়ে দেবার সময় পর্যন্ত নেই। সব কিছুর আগে তাকে দুপুরের ওকতের নমাজ পড়তে হবে। অথচ মোটেই ইচ্ছে করছিল না। তাহলেও ইমাম হিসাবে তার পক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাদ দেওয়া চলে না। খাদ্যের মতই এ জিনিস তার নিজের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন। কাজেই ওজু করে নমাজ পড়ে সে দর্শনার্থীদের ডেকে পাঠায়।

প্রথম এল তার শ্বশুর ও শিক্ষক জামাল এদ্দিন। চুল পাকা লম্বা সুদর্শন এক বৃদ্ধ। মুখখানা গোলাপী রাঙা, দাড়ি বরফের মত সাদা। প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করে সে অভিযান সম্পর্কে শামিলকে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করে এবং তার অনুপস্থিতিতে পাহাড়ে যা ঘটেছে সে সংবাদও জানায়।

বিবিধ সংবাদের মধ্যে খুনোখুনি, গরু-ঘোড়া চুরি এবং তরিকত লঙ্ঘনের (ধূমপান ও মদ্যপান সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা)

খবরও আছে। জামাল এদ্দিন আরও বলে যে হাজি মুরাদ তার পরিবার নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠিয়েছিল ; কিন্তু সে সংবাদ টের পেয়ে তাদের ভেদেনোয় সরিয়ে এনে পাহারায় রাখা হয়েছে। এখন ইমাম যে বিচার করেন তাই হবে। এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রবীণেরা পাশের ঘরে অতিথিশালায় জমায়েত হয়েছেন। তারা যাতে ঐ দিনই চলে যেতে পারে সেজন্য প্রথমেই তাদের সঙ্গে পরামর্শ শেষ করবার উপদেশ দেয় জামাল এদ্দিন। কারণ তিন দিন ধরে তাঁরা অপেক্ষা করছেন শামিলের জন্য।

শামিলের প্রথমা স্ত্রী জাইদত এই ঘরেই তাকে খাবার দিয়ে যায়। রঙ ময়লা নাক খাড়া কুচ্ছিত দর্শন এই স্ত্রী-লোকটিকে সে ভালবাসে না। খাওয়া সেরে পাশের ঘরে যায় শামিল।

ছয় জন প্রবীন নিয়ে শামিলের মন্ত্রণা পরিষদ গঠিত। এদের কারও দাড়ি সাদা, কারও কটা আবার কারও বা লাল। সকলের মাথায় উঁচু কুল্লা পরা। পাগও আছে কারও কারও। শামিল ঢুকতেই নতুন বেশমত আর সিরকাজীয় কুর্তাপরা প্রবীণেরা উঠে দাঁড়ায়। কোমর বন্ধে সকলেরই ছোরা ঝুলান। শামিল এদের সবাইর চাইতে বেশ খানিকটা লম্বা। সে ঘরে ঢুকবার পর সকলেই ঊর্ধে বাহু তুলে চোখ বুজে প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করে, তারপর গালে দাড়িতে হাত বুলিয়ে প্রলম্বিত দাড়ির ডগায় জোড় হাত করে। এরপর সকলেই বসে।

শামিলের কুশনটা আর সবাইর চাইতে খানিকটা বড়। বসে বসে তখন বিভিন্ন মামলা সম্পর্কে আলোচনা সুরু হয়।

ফৌজদারি আসামীদের প্রতি শরিয়ত অনুসারে দণ্ড দেওয়া হয়ঃ চুরির অপরাধে দুজনের হতে কেটে ফেলবার সাজা হয়, খুনের জন্য হুকুম হয় শিরচ্ছেদের আর তিনজনকে ক্ষমা করা হয়। তারপর তারা মুখ্য বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করেঃ কি করে চিচেনদের রুশ পক্ষে যোগ দান করা থেকে নিবৃত্ত করা যায়। এই প্রবৃণতা বোধ করার উদ্দেশ্যে জামাল এদ্দিন নিম্নোক্ত ঘোষণার খসড়া করেঃ

আল্লা তোমাদের চিরশান্তি বিধান করুন।

আমি শুনলাম, আত্মসমর্পণের জন্য রুশরা তোমাদের আমন্ত্রণ ও তোষামোদ করছে। তাদের কথা বিশ্বাস করো না—আত্মসমর্পণ করো না। পরন্তু প্রতিরোধ কর। এ জন্য যদি এ জীবনে পুরস্কৃত না হও তো পর জীবনে অবশ্যই হবে। মনে রেখ, তোমাদের হাতিয়ার নিয়ে নেবার পর কি ঘটেছিল। ১৮৪০ সালের সে-ঘটনার পরেও আল্লা যদি তোমাদের সুবুদ্ধি না দিয়ে থাকেন তো এখনও সৈনিক হও। নতুবা তোমাদের জেনানারা বেইজ্জত হবে। আর কোন দিন পাজামা পড়বে না।

অতীতের নিরিখে ভবিষ্যৎ বিচার কর। বিধর্মী কাফেরদের সঙ্গে বসবাস করার চাইতে রুশদের সঙ্গে শত্রুতা করে মরাও শ্রেয়। আর কিছুদিন সহ্য কর, তারপর পবিত্র কোরাণ এবং তরোয়ালসহ এসে শত্রুর বিরুদ্ধে আমি তোমাদের নেতৃত্ব করব।

কিন্তু এখন আমার কড়া হুকম যে রুশদের কাছে নতি স্বীকারের অভিপ্রায় প্রকাশ করা তো দূরের কথা, তার চিন্তাও করবে না।

শামিল এই ঘোষণা অনুমোদন করে এবং সই করে পাঠিয়ে দেয়।

এর পর হাজি মুরাদের প্রসঙ্গ ওঠে। শামিলের পক্ষে এ ব্যাপারের গুরুত্ব অসীম। মুখে স্বীকার না করলেও শামিল মনে মনে উপলব্ধি করে যে হাজি মুরাদের মত দক্ষ সাহসী লোক যদি তার সঙ্গে থাকত তাহলে চেচনিয়ায় এমন অবস্থা হতেই পারত না। কাজেই হাজি মুরাদের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলে তার সাহায্যলাভের চেষ্টা করা সমীচীন। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, তখন সে যাতে রুশদের সাহায্য করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই প্রলোভন দেখিয়ে ফিরিয়ে এনে খুন করে ফেলতে হবে। তিফলিসে একজনকে পাঠিয়ে একাজ করান যায়, আর না হয় এখানে এনে করতে হয়। এখানে আনাতে হলে তার পরিবারকে কাজে লাগাতে হবে, বিশেষ করে তার ছেলেকে দিয়ে করাতে হবে; কারণ শামিল জানে যে ছেলেকে প্রাণাধিক ভালবাসে হাজি মুরাদ। সুতরাং যা করতে হয় ছেলেকে দিয়েই করাতে হবে।

পারিষদরা একচোট আলোচনা করবার পর শামিল চোখ বুজে নীরবে বসে থাকে। সবাই জানে, ইমাম এই সময় পয়গম্বরের কথা শোনেন। পয়গম্বর তাকে ডেকে ইতিকর্তব্য বলে দেন।

মিনিট পাঁচেক নীরবতার পর চোখ খোলে শামিল এবং স্বাভাবিকের চাইতে আরও খানিকটা বেশী চোখ কুঁচকে বলে, হাজি মুরাদের ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে এস।

এইখানেই আছে। জামাল এদ্দিন বলে। বস্তুত হাজি মুরাদের ছেলে ইউসুফ দরবার কক্ষের বাইরে ডাক পড়বার জন্য অপেক্ষা করছিল। তার বিশীর্ণ পাণ্ডুর চেহারা এবং কুটিল হাসিভরা মুখ এখনও প্রিয়দর্শন। কালো চোখ দুটোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পিতামহী পতিমতের মতই শাণিত।

শামিল সম্পর্কে ইউসুফের মনোভাব বাপের মত নয়। অতীতের সব কিছু তার জানা নেই। খানিকটা খানিকটা জানালেও সে অবস্থার মধ্যে তাকে পড়তে হয়নি বলে কিছুতেই সে বুঝে উঠতে পারে না যে বাবা কেন এমন একগুঁয়ের মত শামিলের বিরুদ্ধতা করেন। শুধু একটি জিনিসই তার কাম্য। নায়েবের পুত্র হিসাবে সে চায় কুজনাখের আয়েসী চরিত্রহীন জীবন। শামিলের শত্রুতা করা সে নেহাৎ অনাবশ্যক বলে মনে করে। আত্মসাতন্ত্র্যের মোহে বাপের বিরুদ্ধাচরণের জন্য শামিলকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করে ইউসুফ এবং পাহাড়েদের মতই পূজা করে। ইমামের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাপ্লুত এক অদ্ভুত আড়ষ্ট মনোভাব নিয়ে সে অতিথিশালায় প্রবেশ করে। চৌকাঠের সামনে থাকতেই শামিলের আধ বোজা চোখের স্থির দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ হয়। পলকের জন্য সে চমকে যায়; তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে শামিলের লম্বা আঙুলওলা প্রশস্ত করতল চুম্বন করে।

তুমিই হাজি মুরাদের ছেলে ?

হাঁ, ইমাম !

সে কি করেছে জান ?

জানি ইমাম, তার আচরণ আমি ঘৃণা করি।

লিখতে জান ?

আমি মোল্লা হবার জন্য লেখাপড়া শিখছিলাম।

তাহলে তোমার বাবাকে লিখে দাও যে বাইরামের ফয়তার আগে এখুনি যদি সে ফিরে আসে তো আমি তাকে মাফ করব এবং সব কিছুই পূর্বের মত হবে। যদি না আসে, রুশপক্ষেই যদি সে থাকে তো—তোমার পিতামহী, তোমার মা এবং আর সবাইকে আমি আলাদা আউলে দিয়ে দেবে আর···আর তোমাকে গর্দান দেব। শেষ কথাটা বলবার সময় শামিলের মুখে কুটিল ভ্রূকুটি ফুটে বেরোয়।

ইউসুফের মুখের একটি পেশীও নড়ল না ; শামিলের কথা শেষ হলে সে মাথা নোওয়ায়।

এই কথা লিখে আমার দূতকে দিয়ে দাও।

এরপর শামিল কথা বন্ধ করে এবং অনেকক্ষণ নীরবে ইউসুফের দিকে চেয়ে থাকে।

লিখে দাও, তোমার প্রতি করুণা করে আনি তোমায় হত্যা করিনি, সমস্ত বিশ্বাসঘাতকের মত তোমায় চোখ উপড়ে নিয়েছি···যাও !

শামিলের সামনে ইউসুফ শান্তই ছিল ; কিন্তু অতিথিশালা

থেকে বাইরে নিয়ে আসবার পরেই প্রহরীর দিকে রুখে এগিয়ে খাপ থেকে তার ছোরাখানা টেনে নিয়ে সে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করে। অমনিই হাত ধরে তাকে প্রতিনিবৃত্ত করা হয় এবং হাত বেঁধে আবার কারা-গহ্বরে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেদিন গোধূলির সময় সান্ধ্য নমাজ পড়ে শামিল সাদা একটা ফারের পট্টি লাগান আলখাল্লা পরে এবং হারেমের বেড়া পার হয়ে অন্দর মহলে সরাসরি আমিনলের ঘরে যায়। সেখানে তার দেখা পেল না। অদৃশ্য থাকার জন্য শামিল তখন কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। কিন্তু তাকে বঞ্চিত করে জাইদতকে কিছু রেশমী কাপড় দেবার জন্য আমিনলের রাগ হয়েছে। সে দেখেছে যে শামিল তার খোঁজে ঘরে ঢুকেছে; তবু ইচ্ছে করেই সে এড়িয়ে থাকে। এদিকে শামিল একবার তার ঘরে ঢুকেছে আবার বেরুচ্ছে। জাইদতের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সব কিছুই লক্ষ্য করে আমিনল। শামিলের সাদা চেহারার দিকে চেয়ে মুচকি হাসে কিন্তু নড়ে না।

অনেকক্ষণ আমিনলের জন্য ব্যর্থ প্রতীক্ষা করে নিজের ঘরে ফিরে আসে শামিল। রাত দুপুরের ওকতের নমাজের সময় তখন হয়ে গেছে।

মেজরের বাড়ীতে দিন সাতেক এসেছে হাজি মুরাদ। সঙ্গে দুজনমাত্র মুরিদ। খানেফি আর এলদারকে এনেছে। বেয়াড়া খানেফির সঙ্গে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা ঝগড়া করত। একবার

সে খানেফিকে রান্নাঘর থেকে বার করে দেয়; সেই রাগে খানেফি তাকে মেরে ফেলবার উপক্রম করেছিল। তাহলেও হাজি মুরাদের প্রতি মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল। আজকাল আর সে হাজি মুরাদের খাবার পরিবেশন করে না। সে ভার এলদার নিয়েছে। তবু তার সঙ্গে দেখা করার কিম্বা তার সেবা করার কোন সুযোগই মারিয়া ছাড়ত না। হাজি মুরাদের পরিবার সম্পর্কে তার ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না। খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছে তার কটি স্ত্রী আর কটিইবা ছেলে মেয়ে এবং যখনই কোন গুপ্তচর এসেছে, খোঁজ খবর জিজ্ঞাসা করে আলোচনার ফলাফল যতটা সম্ভব জেনে নিয়েছে।

এই সাত দিনের মধ্যেই বাটলার হাজি মুরাদের সঙ্গে দোস্তী করে নিয়েছে। কখন কখন হাজি মুরাদও আসত তার ঘরে, আবার কখনও বা সে যেত তার ঘরে। মাঝে মাঝে দোভাষীর মারফতে তাদের আলোচনা হত। আবার কোন কোন সময় হত আকার-ইঙ্গিতে। হাসি দিয়ে তারা পরস্পরকে বুঝবার চেষ্টা করত।

যে করেই হোক হাজি মুরাদেরও মনে লেগেছে বাটলারকে। তার সঙ্গে এলদারের আচরণ থেকেই সেটা অনুমান করা যায়। বাটলার হাজি মুরাদের ঘরে গেলে ঝকঝকে দাঁত বার করে হেসে এলদার তাকে সংবর্ধনা করত এবং চটপট তাকে কুশন পেতে দিত কিম্বা কোমরে তরোয়াল থাকলে সেখানা খুলে নিয়ে রেখে দিত।

হাজি মুরাদের ধর্মের ভাই লোমশ খানেফিকেও বাটলারের ভাল লেগেছে। বহু পাহাড়ে গান জানত খানেফি এবং ভাল গাইতেও পারত। বাটলারকে সন্তুষ্ট করার জন্য হাজি মুরাদ মাঝে মাঝে খানেফিকে দিয়ে গান গাওয়াত। যে গানে তার নিজের ভাল লাগত তাই গাইতে বলত। চড়া ভরাট গলা খানেফির। সুস্পষ্ট মরমী দরদ দিয়েই গান করত। যে গানটি সব চেয়ে হাজি মুরাদের প্রিয়, তার বিষদমাখা সুরের দরদ বাটলারকেও মুগ্ধ করে এবং দোভাষীকে দিয়ে গানের পদ সে তর্জমা করায়।

খানেফি ও হাজি মুরাদের শত্রুতার উপর গানটি রচিত। পদগুলি এই ধরণের ঃ

শুকিয়ে যাবে আমার কবরের মাটি,
মা—আমার মা!
তুমিও ভুলে যাবে আমাকে!
ঘাস তুলবে আমার দেহের উপর,
বাবা—আমার বাবা।
তুমিও দুঃখ করবে না।
কালো চোখে যখন আর জল ঝড়বে না,
বোন—আমার বোন!
শোক আর কাতর করবে না তোমাকে!
কিন্তু তুমি দাদা, কোনকালে ভুলতে পারবে না;
তুমি তো প্রতিশোধ নাওনি!

আর তুমি ছোট ভাই, শোক করবে না তুমিও,
যদি মিথ্যে কথা না বল!

বড় দ্রুত এলে ওগো মৃত্যুবাহী গোলা,
বরাবর তুচ্ছ করেছি তোমায়।
তুমি ছিলে আমার দাস।

আর তুমি কালো মাটি, অশ্বখুড়ে দলিত মথিত
হয়েছে তোমার বুক,
তুমিই ঢেকে রাখবে আমার কবর!

বড় হিমানী তোমার স্পর্শ মৃত্যু!
তবু আমি ছিলাম তোমার প্রভু।
দ্রুত আমার দেহ মিশে যাচ্ছে মাটিতে,
কিন্তু আরও দ্রুত উড়ে চলেছে স্বর্গমুখী আমার আত্মা!

বরাবর চোখ বুজে এই গানটি শুনত হাজি মুরাদ। টানা মিহি সুরে গানটি যখন সাঙ্গ হত, রুশভাষায় সে বলে উঠত, বড় ভাল গান! তত্ত্বকথা আছে!

হাজি মুরাদ এখানে আসবার পর তার সঙ্গে আর তার মুরিদদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত পাহাড়ে জীবনের কাব্য বাটলারের মনে গভীর রেখাপাত করে। একটা বেশমত এবং সিরকাজীর কুর্তা আর পায়ে জড়াবার পট্টি সংগ্রহ করে সে তাই পরে থাকত এবং নিজে পাহাড়ে জীবন যাপন করছে বলে মনে করত।

হাজি মুরাদ চলে যাবার দিন তাকে বিদায় সংবর্ধনা জানাবার জন্য জনকয়েক অফিসারকে আমন্ত্রণ করে মেজর। জন কয়েক টেবিলের পাশে বসেছিল আর মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা চা ঢেলে দিচ্ছিল তাদের। জন কয়েক ছিল আর এক টেবিলে। সেখানে ভোদকা, চিখির এবং সামান্য জলপানের আয়োজন করা হয়েছে। এই সময় যাত্রার সাজসজ্জা করে পা টেনে টেনে চটপট ঘরে ঢোকে হাজি মুরাদ।

সবাই দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করে। মেজর তাকে ডিভানের উপর বসবার অনুরোধ জানায়। হাজি মুরাদ তাকে ধন্যবাদ দিয়ে জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসে।

সে ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই কথা বন্ধ করে; কিন্তু হাজি মুরাদ তাতে বিন্দুমাত্র বিব্রত বোধ করেনি। একে একে সে সব ক'খানি মুখ দেখে নেয়; তারপর জলখাবার ও স্যামোভার সাজান টেবিলের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকায়। পেত্রভস্কি নামে হাসিখুশি এক অফিসার এই প্রথম হাজি মুরাদকে দেখে। দোভাষীর মারফত সে জিজ্ঞাসা করে যে তিফলিস্ তার ভাল লেগেছে কিনা।

আলিয়া! সে জবাব দেয়।

বলছে হাঁ। দোভাষী তর্জমা করে।

কোনটা সবচেয়ে ভাল লেগেছে?

হাজি মুরাদ কি একটা বলে।

বলছে, থিয়েটারটা।

প্রধান সেনাপতির বাড়ীতে বলনাচ কেমন লেগেছে?

হাজি মুরাদ ভুরু কোঁচকায়। মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার দিকে আড়চোখে চেয়ে বলে, সব জাতেরই নিজস্ব রীতি আছে। আমাদের মেয়েরা অমনভাবে পোশাক করে না।

কি, ভাল লাগেনি?

হাজি মুরাদ তখন দো-ভাষীকে বলে, একটা প্রবাদ আছে আমাদের দেশে: একটা কুকুর এক টুকরো মাংস দিল গাধাকে আর গাধাটা খড় দিল কুকুরটাকে—দুটোই ক্ষুধার্ত রইল। তারপর হেসে বলে, প্রত্যেক জাতের পক্ষেই নিজের নিজের রীতি ভাল।

আলোচনা আর এগোল না। জনকয়েক অফিসার শুধু চা খেল আর জনকয়েক অন্যান্য খাবার খায়। হাজি মুরাদ এক মগ চা নিয়ে নিজের সামনে রাখে।

তার সামনে কিছু বান ও মাখন নিয়ে গিয়ে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা বলে, মাখন বান নেবেন না?

হাজি মুরাদ মাথা নীচু করে।

তার হাঁটুতে হাত দিয়ে বাটলার বলে, বিশ্বাস এই শেষ দেখা! আবার কবে দেখা হবে? হাজি মুরাদ তখন হেসে রুশ ভাষায় বলে, গুড বাই; গুড বাই! কুনাক বুলুগ! সময়-আইডা···যাব! মাথার ইশারা করে সে গন্তব্য পথ দেখায়।

কাঁধে মস্ত সাদা একটা পুঁটুলি এবং হাতে তরোয়াল নিয়ে এলদার এই সময় দোর গোড়ায় আসে। হাজি মুরাদ তার

দিকে চায়। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর পেরিয়ে গিয়ে এলদার তার হাতে একটা সাদা বোরকা এবং একখানা তরোয়াল দেয়। হাজি মুরাদ দাঁড়িয়ে বোরকাটা নেয় এবং হাতের পর ফেলে দোভাষীকে কি যেন বলে বোরকাটা মারিয়া দিমিত্রিয়েভনাকে দেয়।

দোভাষী বলে, আপনি এটার প্রশংসা করেছিলেন তাই আপনাকে দিল।

সেকি, কেন? থতমত খেয়ে লাজ-রক্তিম মুখে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা বলে।

দরকার আছে। আদমের মত। হাজি মুরাদ বলে।

বেশ, ধন্যবাদ! বোরকাটি নিয়ে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা বলে।—ভগবান করুন, ছেলেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসুন! উলান ইয়কসি! ওকে বলুন যে আমি ওর ছেলে উদ্ধারের প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করছি।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে সায় দেয় হাজি মুরাদ। তারপর এলদারের কাছ থেকে তরোয়াল খানা নিয়ে মেজরকে দেয়। মেজর হাত বাড়িয়ে নিয়ে বলে, ওকে আমার বাদামি ঘোড়াটা নিতে বলুন। আর কিছুই আমার দেবার নেই।

হাজি মুরাদ তার মুখের সামনে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দেয় যে সে কিছুই চায় না এবং কিছু নেবেও না। তারপর আঙুল দিয়ে প্রথম পাহাড়ের দিকে ইশারা করে, পরে নিজের বুকে হাত দিয়ে সে বেরিয়ে যায়।

বাড়ীর সবাই দরজা অবধি তার অনুগমন করে। ঘরে যে সব অফিসার ছিল, খাপ থেকে তরোয়াল খানা বার করে তারা রায় দেয় যে খাঁটি গুর্দার (১) তরোয়াল।

বাটলার বারান্দা অবধি হাজি মুরাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়। তারপর এমন অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা ঘটে যে অমন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি দৃঢ়তা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব না থাকলে হাজি মুরাদের প্রাণান্ত হতে পারত।

রাশিয়ার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কুমিখ আউল তাশ-কিচুর অধিবাসীরা হাজি মুরাদকে অসীম শ্রদ্ধা করত এবং এই প্রসিদ্ধ নায়েবকে দেখবার জন্য বহুবার এই কেল্লায় এসেছে। তিনদিন আগে লোক পাঠিয়ে তারা হাজি মুরাদকে জুম্মাবারে মসজিদ পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করে। কিন্তু তাশ-কিচুতে যে কুমিক নবাবজাদারা বাস করত, তার ঘৃণা করত হাজি মুরাদকে ; কারণ তার সঙ্গে তাদের খুনোখুনির সম্পর্ক। এই আমন্ত্রণের কথা শুনে তারা ঘোষণা করে যে হাজি মুরাদকে কিছুতেই তারা মসজিদে ঢুকতে দেবে না। জনসাধারণ এই ঘোষণায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নবাবজাদাদের সমর্থক এবং তাদের মধ্যে এই নিয়ে এক খণ্ডযুদ্ধও হয়ে যায়। রুশ কর্তৃপক্ষ পাহাড়েদের শান্ত করে এবং হাজি মুরাদকে যেতে নিষেধ করে দেয়।

হাজি মুরাদ যায়নি। সবাই ভেবেছে ব্যাপারটা এই খানেই শেষ হয়ে গেছে।

---

(১) অতি মূল্যবান এবং সরেস ইস্পাত।

কিন্তু যাত্রার সময় যখন সে বারান্দায় আসে, আরস্‌লান খাঁ নামে এক কুমিক প্রিন্স এই সময় ঘোড়ায় চড়ে হাজির হয়। বাটলার ও মেজরের পরিচিত লোকটি।

হাজি মুরাদকে দেখেই বেল্ট থেকে সে পিস্তল টেনে বার করে। কিন্তু গুলি করবার আগেই খোঁড়া পা সত্বেও বেড়ালের মত হাজি মুরাদ বরান্দা থেকে লাফিয়ে তার দিকে রুখে এগোয়। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

তখন এক হাতে আরসলান খাঁর ঘোড়ার বলগা ধরে অপর হাতে হাজি মুরাদ ছোরা বার করে এবং তাতার ভাষায় চীৎকার করে কি যেন বলে।

বাটলার ও এলদার ইতিমধ্যে ছুটে গিয়ে দুই শত্রুকে টেনে সরিয়ে দেয়। গুলির আওয়ার শুনে মেজরও বাইরে আসে।

ঘটনার বিবরণ শুনে বলে, একি আরসলান, আমার বাড়ীতেই এই সব জঘন্য কাজ করতে যাচ্ছিলে! ভাল করনি বন্ধু! রণক্ষেত্রে শত্রুর কাছে হার স্বীকার করতে নেই; আর তুমি আমার বাড়ীর সামনে এ রকম খুনোখুনি করতে……!

কালো গোঁফওলা বেঁটে লোক আরসলান খাঁ। বিবর্ণ মুখে ঘোড়া থেকে নেমে কাঁপতে কাঁপতে সে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে হাজি মুরাদের দিকে তাকায়। তারপর মেজরের সঙ্গে ঘরে চলে যায়। ঘন ঘন শ্বাস ফেলে হাসি মুখে ঘোড়ার কাছে ফিরে আসে হাজি মুরাদ।

ওকে খুন করতে চেয়েছিলে কেন? দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করে বাটলার।

হাজি মুরাদের জবাব তর্জমা করে দোভাষী বলেঃ বলছে, এ ওদের রীতি। আত্মীয় হত্যার প্রতিশোধ আরসলানকে নিতেই হবে। সেই জন্যই সে খুন করতে চেয়েছিল।

ধরো পথে যদি আবার আক্রমণ করে? বাটলার জিজ্ঞাসা করে।

যদি খুন করতেই পারে তো বুঝতে হবে, আল্লার তাই ইচ্ছা!…বিদায়! ঘোড়ার গায়ে হাত দিয়ে সে বলে। বিদায় সংবর্ধনা জানাবার জন্য যারা এসেছিল একে একে সবাইর দিকে চেয়ে শেষ অবধি প্রসন্নদৃষ্টিতে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার মুখের দিকে চেয়ে বলে, বিদায় মেয়ে! ধন্যবাদ!

ভগবান আপনার সহায় হউক! ভগবান করুন যেন আপনার পরিবার উদ্ধার করতে পারেন। বলে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা।

মারিয়ার কথা হাজি মুরাদ বুঝল না। তবু বলবার ভঙ্গী দেখে অনুমান করল যে সহানুভূতি প্রকাশ করছে। মাথা নেড়ে সে কৃতজ্ঞতা জানাল।

মনে থাকে যেন, কুনাককে ভুলবেন না। বাটলার বলে।

ওকে বলুন, আমি ওর অকৃত্রিম বন্ধু, কোন দিনই ভুলব না। দো-ভাষীর জবাবে বলে হাজি মুরাদ। খোঁড়া পা সত্বেও রেকাবের পর পা ঠেকিয়ে অনায়াসে চটপট সে উঁচু জিনের

উপর চড়ে বসে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোরা ও তরোয়ালে হাত দিয়ে ঠিকঠাক করে নেয়। এমন গর্বোন্নত ভঙ্গীতে সে ঘোড়ার পিঠে বসে যা শুধু ককেসীয় পাহাড়েদের পক্ষেই সম্ভব। বাহনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় যেন। এই ভাবেই সে মেজরের বাড়ী ছেড়ে যায়। খানেফি এবং এলদারও ঘোড়ায় চড়ে এবং বন্ধুভাবে গৃহস্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কদমে ছুটে মুরশেদের অনুসরণ করে।

ওরা চলে যাবার পর যারা রইল, স্বভাবতই তারা যারা গেল তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করে।

ওস্তাদ লোক। আরসলানের দিকে নেকড়ের মত ছুটে গিয়েছিল। চট করে মুখের চেহারা বদলে যায়!

আমার ধারণা নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে—মারাত্মক বদমায়েস্! পেত্রভস্কি বলে।

বড়ই দুঃখের কথা রাশিয়ায় এমন বদমায়েস খুব বেশী নেই! বিরক্তিভাবে বলে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা।—দিন সাতেক আমাদের এখানে ছিল, ভাল ছাড়া কোন মন্দ আচরণ তো দেখিনি। লোকটা যেমন ভদ্র, তেমনি বিজ্ঞ, আবার তেমনি ন্যায়পরায়ণ।

কি করে বুঝলে?

যে করেই হোক বুঝেছি!

এই সময় মেজর ঘরে ঢুকে বলে, ওর মাথা বিগড়ে দিয়েছে। বুঝলে হে!

বেশ তো, দিয়ে থাকে দিয়েছে! তাতে তোমার কি? ভাল লোক হলে তার নিন্দে করবে কেন? তাতার হলেও লোকটা সৎ।

ঠিক কথা, মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা। বাটলার বলে।—ওর পক্ষ নিয়ে ভালই করেছ।

চিনেন লাইনের অগ্রগামী কেল্লার জীবন যথারীতি চলতে থাকে। আগে যে ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে তারপর মাত্র দুটি বিপদের সঙ্কেত হয়। কোম্পানীগুলোকে আহ্বান করা হয় এবং মিলিশিয়ার লোকজন খানিকটা ছুটাছুটি করে। কিন্তু যে-পাহাড়েরা এই উত্তেজনা সৃষ্টি করে, দুইবারেই তারা পালিয়ে যায়। ভোজদভিঝিনস্কে একবার এক কজাক আটটি ঘোড়াকে জল খাওয়াচ্ছিল। কজাকটিকে খুন করে সেবার পাহাড়েরা ঘোড়া কটি নিয়ে পালিয়ে যায়। সেই চিচেন আউলটি ধ্বংস করার পর এ পক্ষ থেকে কোন বড় রকম হানা দেওয়া হয় নি। কিন্তু বামপার্শ্বের সেনাপতির পদে প্রিন্স বারিয়াতিনস্কির নতুন নিয়োগের পর ব্যাপক এক অভিযান শিগগিরই আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়। রাজ-প্রতিনিধির পুরনো বন্ধু বারিয়াতিনস্কি। আগে কাবারদা রেজিমেন্টের কমাণ্ডার ছিল। গোটা বামপার্শ্বের কমাণ্ডার হিসাবে গ্রজনিতে আসার পরেই চার্নিশভ কর্তৃক ভরন্তসভের নিকট প্রেরিত জারের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করারর জন্য সে একটি সৈন্যদল জড়ো করে।

ভোজদভিঝিনস্কের সেনা-দলটি কেল্লা ছেড়ে কুরিনের কাছাকাছি ছাউনি ফেলে। এবং গাছ কাটতে শুরু করে। ছোট ভরন্তসভ এক চমৎকার কাপড়ের তাঁবুতে বাস করত। তার স্ত্রী মারিয়া ভাসিলিয়েভনাও প্রায়ই এখানে এসে রাত্রিবাস করত। বারিয়াতিনস্কির সঙ্গে ভাসিলেভনার সম্পর্কে আর কারও কাছে গোপন নেই। অভিজাত শ্রেণীর নয় এমনি অফিসার ও সৈনিকেরা যা-তা বলে তাকে খিস্তি করত। কারণ সে তাঁবুতে এলেই তাদের রাত্রে গোপন পাহারায় যেতে হত। পাহাড়েরা কামান নিয়ে এসে তাঁবু লক্ষ্য করে তোপ দাগত। আর তাঁবুও থাকত পাল্লার মধ্যে। তবে গোলা প্রায়শ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হত। কাজেই তোপ দাগা বন্ধ করার জন্য সাধারণত কোন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হত না। কিন্তু মারিয়া ভাসিলেভনা এলেই পাহাড়েরা যাতে তাকে ভয় দিতে কিম্বা আহত করতে না পারে সেজন্য পাহারা বসাতে হত। এক মহিলাকে ভয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সারারাত বনের মধ্যে কাটবার বাধ্যতা সৈনিকেরা বিরক্তিকর ও অপমানজনক মনে করত। কাজেই তারা এবং সমাজের উপর তলায় প্রবেশের অধিকার-বঞ্চিত অফিসাররা তাকে জঘন্য ভাষায় খিস্তি করত।

ক্যাডেট কোরের সাবেক মেসের সঙ্গী এবং কুরিন রেজিমেণ্টের অফিসারদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কেল্লা থেকে ছুটি নিয়ে ছাউনিতে এল বাটলার। কুরিন রেজিমেণ্টের অফিসাররা এখানে এডজুটাণ্ট ও আরদালি অফিসার পদে কাজ

করছে। প্রথম প্রথম তার ভালই লেগেছে। পলতোরাতস্কির তাঁবুতে সে ওঠে এবং সেখানে বহু পরিচিতের সঙ্গে দেখা হয়। সবাই তাকে সাদর অভ্যর্থনা করে। ভরন্তসভের সঙ্গেও সে দেখা করে। সামান্য পরিচয় ছিল তার সঙ্গে। এক সময় দুজনেই এক রেজিমেন্টে কাজ করেছে। ভরন্তসভ তাকে সাদর অভ্যর্থনা করে, বারিয়াতিনস্কির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং জেনারেল কোজলভস্কির বিদায় সংবর্ধনার ডিনারে তাকে আমন্ত্রণ করে। আগে কোজলভস্কিই ছিল গোটা বামপার্শ্বের কমাণ্ডার।

ডিনারের বেশ জমকাল আয়োজনই হয়। সার বন্দী নতুন তাঁবু খাটিয়ে তার মধ্যে সবটা দৈর্ঘ্য জুড়ে একখানা টেবিল পাতা হয়। ডিনার পার্টির উপযোগী খাদ্য পানীয় আর পরিবেশন ব্যবস্থারও কোন ত্রুটি ছিল না। আয়োজন দেখে পেতরবুর্গের গার্ড দলের জীবনের কথা মনে পড়ে। দুটোর সময় ডিনার দেওয়া হয়। কোজলভস্কি এক পাশে মাঝামাঝি জায়গায় বসে। বারিয়াতিনস্কি বসে তার মুখোমুখি। কোজলভস্কির ডাইনে বাঁয়ে ভরন্তসভ দম্পতি। গোটা টেবিল জুড়ে উভয় পার্শ্বে বসেছে কাবারদা ও কুরিন রেজিমেন্টের অফিসাররা। পলতোরাতস্কির পাশাপাশি বসে বাটলার এবং খোস মেজাজে গল্প করতে করতে পাশাপাশির অফিসারদের সঙ্গে মদ্যপান করে। রোস্ট পরিবেশনের পর আরদালিরা ঘুরে ঘুরে যখন সব গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে দিয়ে যায়, উদ্বিগ্নভাবে বাটলারকে বলে

পলতোরাতস্কি, আমাদের কোজলভস্কি আজ কেলেঙ্কারি করবে।

কেন ?

কেন ? বক্তৃতা দিতে হবে যে! ও কি বক্তৃতা দিতে জানে নাকি ?.......বক্তৃতা করা গুলির সামনে ঘাঁটি দখলের মত সহজ কাজ নয়। তাছাড়া একজন মহিলা আর একজন অভিজাতও রয়েছে এখানে !

সত্যি, বেচারির মুখের দিকে তাকালে কষ্ট হয়। অফিসাররা বলাবলি করে। এতক্ষণে সেই পরম মূহূর্ত আসে। বারিয়াতিনস্কি উঠে দাঁড়িয়ে গ্লাস হাতে নিয়ে কোজলভস্কিকে লক্ষ্য করে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেয়। তার বক্তৃতা শেষ হলে কোজলভস্কি উঠে দাঁড়ায় এবং তোতলাতে তোতলাতে বলতে শুরু করে ঃ

মহামান্য সম্রাটের অভিপ্রায় অনুযায়ী আমি আপনাদের ছেড়ে যাচ্ছি......আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ভদ্রমহোদয়গণ। কিন্তু আমি সর্বদা আপনাদের সঙ্গে আছি বলে গণ্য করবেন। রণক্ষেত্রে যারা আছে তারাই শুধু যোদ্ধা নয়, এই প্রবাদের তাৎপর্য আপনাদের জানা আছে।...... কাজেই ইয়ে যত পুরস্কার পেয়েছি......আমাদের মহামান্য সম্রাটের মহানুভবতার গুণে ইয়ে যত সুবিধা আমার উপর বর্ষিত হয়েছে......আমায় ইয়ে যত পদমর্যাদা......ইয়ে যত সুনাম.......ইয়ে যেমন সুনিশ্চিতভাবে সব কিছু ইয়ে...... (এই জায়গায় এসে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়)......আমি ইয়ে

আপনাদের কাছে, শুধু আপনাদের কাছেই এই সবের জন্য ঋণী বন্ধুগণ! কোজলভস্কির ভাঁজপরা মুখ আরও কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। এক অস্ফুট কঁকানির সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে জল দেখা দেয়!······ইয়ে সর্বান্তকরণে আপনাদের আমি অকপট ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আর বলতে পারল না কোজলভস্কি। মোড় ঘুরে সে অফিসারদের আলিঙ্গন করতে আরম্ভ করে। প্রিন্সেস রুমালে মুখ ঢাকলেন। প্রিন্স মুখের হাঁ বাঁকিয়ে ধীরে ধীরে চোখে টিপ মারতে লাগলেন। বহু অফিসারের চোখ ভিজে ওঠে। কোজলভস্কিকে চিনত না বাটলার, তবু সেও চোখের জল সামলাতে পারল না। এই সমস্ত কিছুই সে পছন্দ করে।

এরপর অন্যান্য 'টোস্ট' শুরু হয়। একে একে বারিয়াতিনস্কি ভরন্তসভ, অফিসার গোষ্ঠী এবং সৈনিকদের স্বাস্থ্য কামনা করে মদ্যপান করা হয় এবং রীতিমত মাতাল হয়ে সামরিক গর্ব নিয়ে অফিসাররা টেবিল ছেড়ে ওঠে। আবহাওয়াটা চমৎকার, যেমন রোদে ঝলমল তেমনি স্নিগ্ধ! বাতাস যেমন ফুরফুরে তেমনি কনকনে। এখানে ওখানে আগুনের কুণ্ড—চারিদিক গানে মুখরিত। মনে হয় সবাই মিলে যেন কোন উৎসবে মেতেছে। দিলদরিয়া খোস মেজাজে পলতোরাতস্কির বাসায় যায় বাটলার। আরও জনকয়েক অফিসার সেখানে জমায়েত হয়েছে, তাসের আসরও প্রস্তুত। একশ' রুবল দিয়ে এডজুটাণ্ট তহবিল খোলে। পাতলুনের পকেটে মনিব্যাগে হাত দিয়ে তাঁবুর মধ্যে আসা

পলতোরাতস্কি, আমাদের কোজলভস্কি আজ কেলেঙ্কারি করবে।

কেন ?

কেন ? বক্তৃতা দিতে হবে যে! ও কি বক্তৃতা দিতে জানে নাকি ?……বক্তৃতা করা গুলির সামনে ঘাঁটি দখলের মত সহজ কাজ নয়। তাছাড়া একজন মহিলা আর একজন অভিজাতও রয়েছে এখানে!

সত্যি, বেচারির মুখের দিকে তাকালে কষ্ট হয়। অফিসাররা বলাবলি করে। এতক্ষণে সেই পরম মূহূর্ত আসে। বারিয়াতিনস্কি উঠে দাঁড়িয়ে গ্লাস হাতে নিয়ে কোজলভস্কিকে লক্ষ্য করে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেয়। তার বক্তৃতা শেষ হলে কোজলভস্কি উঠে দাঁড়ায় এবং তোতলাতে তোতলাতে বলতে শুরু করে :

মহামান্য সম্রাটের অভিপ্রায় অনুযায়ী আমি আপনাদের ছেড়ে যাচ্ছি……আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ভদ্রমহোদয়গণ। কিন্তু আমি সর্বদা আপনাদের সঙ্গে আছি বলে গণ্য করবেন। রণক্ষেত্রে যারা আছে তারাই শুধু যোদ্ধা নয়, এই প্রবাদের তাৎপর্য আপনাদের জানা আছে।……কাজেই ইয়ে যত পুরস্কার পেয়েছি……আমাদের মহামান্য সম্রাটের মহানুভবতার গুণে ইয়ে যত সুবিধা আমার উপর বর্ষিত হয়েছে……আমায় ইয়ে যত পদমর্যাদা……ইয়ে যত সুনাম……ইয়ে যেমন সুনিশ্চিতভাবে সব কিছু ইয়ে……(এই জায়গায় এসে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়)……আমি ইয়ে

আপনাদের কাছে, শুধু আপনাদের কাছেই এই সবের জন্য ঋণী বন্ধুগণ! কোজলভস্কির ভাঁজপরা মুখ আরও কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। এক অস্ফুট কঁকানির সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে জল দেখা দেয়!……ইয়ে সর্বান্তকরণে আপনাদের আমি অকপট ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আর বলতে পারল না কোজলভস্কি। মোড় ঘুরে সে অফিসারদের আলিঙ্গন করতে আরম্ভ করে। প্রিন্সেস রুমালে মুখ ঢাকলেন। প্রিন্স মুখের হাঁ বাঁকিয়ে ধীরে ধীরে চোখে টিপ মারতে লাগলেন। বহু অফিসারের চোখ ভিজে ওঠে। কোজলভস্কিকে চিনত না বাটলার, তবু সেও চোখের জল সামলাতে পারল না। এই সমস্ত কিছুই সে পছন্দ করে।

এরপর অন্যান্য 'টোস্ট' শুরু হয়। একে একে বারিয়াতিনস্কি ভরন্তসভ, অফিসার গোষ্ঠী এবং সৈনিকদের স্বাস্থ্য কামনা করে মদ্যপান করা হয় এবং রীতিমত মাতাল হয়ে সামরিক গর্ব নিয়ে অফিসাররা টেবিল ছেড়ে ওঠে। আবহাওয়াটা চমৎকার, যেমন রোদে ঝলমল তেমনি স্নিগ্ধ! বাতাস যেমন ফুরফুরে তেমনি কনকনে। এখানে ওখানে আগুনের কুণ্ড—চারিদিক গানে মুখরিত। মনে হয় সবাই মিলে যেন কোন উৎসবে মেতেছে। দিলদরিয়া খোস মেজাজে পলতোরাতস্কির বাসায় যায় বাটলার। আরও জনকয়েক অফিসার সেখানে জমায়েত হয়েছে, তাসের আসরও প্রস্তুত। একশ' রুবল দিয়ে এডজুটাণ্ট তহবিল খোলে। পাতলুনের পকেটে মনিব্যাগে হাত দিয়ে তাঁবুর মধ্যে আসা

যাওয়া করে বাটলার ; কিন্তু শেষ অবধি লোভ সামলাতে পারল না। ভাইয়ের কাছে শপথ করা সত্বেও প্রতিজ্ঞা ভেঙে সে খেলতে বসে। নিজের মনে মনে প্রতিজ্ঞাও টিকল না। ঘণ্টা খানেক যেতে না যেতেই লাল হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে হাতে চা-খড়ি মেখে সে খেলায় মেতে যায়। টেবিলের পর দুই কনুই ভর করে নিবিষ্টমনে তাসের তলায় বাজির অঙ্ক লিখতে থাকে। এত অর্থ সে হেরে যায় যে তার কাছে পাওনার অঙ্ক যোগ দিতে সাহস হচ্ছিল না। তবু না গুনেও সে বুঝতে পারে যে আগাম যত মাইনে টানা যায় তার সঙ্গে নিজের ঘোড়ার দাম যোগ করলেও অপরিচিত এডজুটান্টের পাওনা শোধ করা যাবে না। তবু তাকে খেলে যেতে হবে! কিন্তু এডজুটাণ্ট এই সময় রুক্ষ মেজাজে নিজের হাতের তাস কখানা চিং করে ধরে এবং খড়ি দিয়ে লেখা অঙ্ক যোগ দিয়ে বাটলারের হারের হিসাব করে। বাটলার তখন থতমত খেয়ে একসঙ্গে সব পাওনা শোধ করবার অসামর্থ্য জানায় এবং বলে যে বাড়ী থেকে আনিয়ে শোধ করবে। সে বেশ বুঝতে পারে যে এই কথা বলবার সময় উপস্থিত সবাই তার দিকে করুণার চোখে চাইছে এবং সকলেই, এমন কি পলতোরাতস্কিও তার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। এখানে এই-ই শেষ সন্ধ্যা। তখন তার মনে হয় যে না খেললেই ভাল হত। সে যদি শুধু ভরন্তসভের নিমন্ত্রণে যেত তাহলে কোন গোলমালই হত না। কিন্তু এখন যা ঘটেছে তা শুধু গোলমেলেই নয়, সর্বনেশে।

সাথী ও পরিচিতদের কাছে বিদায় নিয়ে সে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ী ফিরে আসে এবং সরাসরি শুয়ে পড়ে। একটানা আঠার ঘণ্টা ঘুমোয় বাটলার। এমন হারের পর লোকে এমনিভাবেই ঘুমোয়। বাটলারের কাটাকাটা সংক্ষিপ্ত জবাব এবং মুখ-চোখের করুণ চেহারা এবং সে যখন কজাক সঙ্গীটিকে বকশিশ্ দেবার জন্য পঞ্চাশ কোপেক ধার চায়, তাই দেখে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা তখনই বুঝতে পারে যে সে তাসে হেরেছে। বাটলারকে ছুটি দেবার জন্য তখন সে মেজরকে তিরস্কার করে।

পরদিন দুপুরে ঘুম ভেঙে গেলে যখন নিজের অবস্থার কথা মনে পড়ে, ভাবে আবার ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেই ভাল হয়। বিস্মৃতিই এখন তার কাম্য। কিন্তু অচেতন হয়ে পড়ে থাকা চলবে না। অপরিচিতের কাছে এই চারশ সত্তর রুবল ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা করতেই হবে। প্রথমে সে ভাইয়ের কাছে চিঠি লেখে। অপরাধ স্বীকার করে শেষ বারের মত তাকে পাঁচশ রুবল ধার দেবার জন্য অনুরোধ জানায়। এজন্য সে তাদের যৌথ মালিকানার মিলের তার অংশ বন্ধক রাখতেও স্বীকৃত হয়। তারপর এক কিপ্‌টে আত্মীয়ের কাছে যে কোন সুদের হারে পাঁচশ রুবল ধার চায়। মেজর মানে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার কাছে কিছু অর্থ ছিল। অবশেষে মেজরের কাছে গিয়ে সে পাঁচশ রুবল ধার চায়।

মেজর বলে, এখুনি তোমায় দিয়ে দিতাম, কিন্তু মাশা রাজী হবে না। এই মেয়েগুলো এমন কিপটে যে এদের বুঝে ওঠা

ভার।....যাই হোক, এ থেকে তোমায় পার পেতে হবে তো !... আচ্ছা, ক্যানটিনওলার কাছে কিছু নেই ?

ক্যানটিনওলার কাছে ধার চাওয়া অর্থহীন। কাজেই ভাই কিম্বা ঐ কিপটে আত্মীয় দয়া করলেই বাটলার রক্ষা পেতে পারে।

চেচানিয়ায় উদ্দেশ্য সফল হল না দেখে তিফলিসে ফিরে এল হাজি মুরাদ। প্রতিদিন সে ভরন্তসভের বাড়ীতে যেত এবং রাজ প্রতিনিধির সাক্ষাৎ পেলেই সমস্ত পাহাড়ে বন্দী জড়ো করে তার পরিবারের সঙ্গে বদলী করার অনুরোধ জানাত। বলত যে তার হাত বাঁধা, এটুকু না করলে সে রুশদের সেবা করতে পারছেনা কিম্বা নিজের প্রতিজ্ঞানুযায়ী শামিলকেও ধ্বংস করতে পারছে না। ভরন্তসভ যথাসাধ্য করবার অস্পষ্ট আশ্বাস দিতেন। জেনারেল আরগুতিনস্কি তিফলিসে এলে তার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করবেন বলেও মাঝে মাঝে এড়িয়ে যেতেন।

হাজি মুরাদ তখন ট্রান্স-ককেসিয়ার এক ছোট্ট শহর নুখায় যাবার অনুমতি চায়। তার বিশ্বাস, এখানে কিছুদিন থাকতে পারলে ভালভাবে সে শামিলের সঙ্গে আলোচনা চালাতে পারবে এবং নিজের অনুগত লোকজনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তাছাড়া নুখা মুসলিম শহর; কাজেই সেখানে গেলে মসজিদে নমাজ পড়ারও সুবিধা হয়। ভরন্তসভ এ সম্পর্কে পেতরবুর্গে লেখেন এবং অনুমতি আনবার আগেই হাজি মুরাদকে নুখা যাবার অনুমতি দেন।

ভরন্তসভ, পেতরবুর্গের কর্তৃপক্ষ, কিম্বা হাজি মুরাদের সঙ্গে পরিচিত অধিকাংশ রুশ সমস্ত ব্যাপারটাকে ককেসাসের যুদ্ধের এক শুভ পরিবর্তন কিম্বা একটা মজার ঘটনা বলে গ্রহণ করেছে। কিন্তু হাজি মুরাদের পক্ষে এ ঘটনা মারাত্মক সংকটের মত। অন্তত পরে তাই মনে হয়েছে। কতকটা আত্মরক্ষার জন্য এবং কতকটা শামিলের প্রতি ঘৃণাবশে সে পাহাড় ছেড়ে এসেছে। পলায়ন সুকঠিন কাজ; তবু সে লক্ষ্যে উপনীত হয়। এই সাফল্যের জন্য দিন কয়েক সে খুশিও ছিল। এবং সত্যিই শামিলকে আক্রমণ করার এক পরিকল্পনা করে। আগে ভেবেছে, পরিবারের উদ্ধারকার্য সহজ হবে। কিন্তু এখন বুঝছে মোটেই সহজ নয়।

শামিল তার পরিবারকে গ্রেপ্তার করে বন্দী করে রেখেছে। ভয় দেখাচ্ছে, মেয়েদের বিভিন্ন আউল বিলি করে দেবে এবং ছেলেকে অন্ধ কি বধ করবে। এইবার নুখা আসার উদ্দেশ্য, দাগেস্তানের অনুগত লোকজনের সাহায্যে কৌশলে কি জোর করে শামিলের হাত থেকে পরিবারের উদ্ধারের চেষ্টা করা। সর্বশেষে সে গুপ্তচর হাজি মুরাদের কাছে আসে সে বলে যায় যে, অনুগত আভররা তার পরিবারকে ছিনিয়ে আনবার জন্য তৈরী হচ্ছে এবং তারা নিজেরাই ওদের রুশদের কাছে নিয়ে আসবে। কিন্তু লোকবল ওদের বেশী নয়; কাজেই ভেদেনোর উপর আক্রমণ করতে ভরসা পাচ্ছে না। তবে ভেদেনো থেকে তার পরিবারকে অন্য কোথাও যদি সরান হয় তো পথিমধ্যেই তারা উদ্ধার করে নিয়ে আসবে।

বন্ধুদের কাছে হাজি মুরাদ সংবাদ পাঠায় যে তার পরিবারের মুক্তিমূল্য বাবদ সে তিন হাজার রুবল দেবে।

নুখাতে মসজিদ আর খাঁ'র প্রসাদের কাছাকাছি পাঁচ কামরার একখানা ছোট্ট বাড়ী হাজি মুরাদকে দেওয়া হয়। ভারপ্রাপ্ত অফিসার, তার দো-ভাষী আর অনুচর সেই বাড়ীতেই থাকে। পাহাড় থেকে চর আসার প্রতীক্ষা করা, তাদের অভ্যর্থনা করা এবং কাছাকাছি সামান্য ভ্রমণ—এই নিয়েই হাজি মুরাদের জীবন।

২৪শে এপ্রিল-ভ্রমণ থেকে ফিরে হাজি মুরাদ শুনতে পায় যে ভরন্তসভের কাছ থেকে এক অফিসার এসেছে। অফিসার কি সংবাদ নিয়ে এসেছে তা জানবার কৌতূহল থাকা সত্বেও প্রথমে সে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে দুপুরের ওকতের নমাজ পড়ে। তারপর ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং নবাগত কর্মচারীটি যে-ঘরে বসেছিল সেইখানে যায়। এই রুমটিকে সে বৈঠকখানা এবং অভ্যর্থনা-গৃহ উভয় ভাবেই ব্যবহার করে।

তিফলিস থেকে আগত কর্মচারী কাউন্সিলার কিরিলভ জানায় যে ভরন্তসভ তাকে জেনারেল আরগুতিনস্কির সঙ্গে দেখা করবার জন্য বারোই তারিখ তিফলিস যেতে বলেছেন।

ইয়কসি! ক্রুদ্ধভাবে হাজি মুরাদকে বলে। কাউন্সিলরটিকে তাহার ভাল লাগেনি।—অর্থ এনেছেন?

এনেছি। কাউন্সিলার জবাব দেয়।

দু সপ্তাহ পাইনি! হাজি মুরাদ প্রথম দুই হাতের আঙুল দেখায়; তারপর চারটি আঙুল দেখায়।—দিন!

এখুনি দিচ্ছি! ব্যাগ থেকে টাকার থলেটি বার করতে করতে কাউন্সিলর বলে। হাজি মুরাদ রুশ ভাষা বুঝবে না অনুমান করে সে বলে, অর্থ চায় কেন? হাজি মুরাদ কিন্তু বুঝতে পারে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। ফিরে গিয়ে ভরন্তসভের কাছে বলবার উদ্দেশ্য হাজি মুরাদের সঙ্গে আলাপ জমাবার আশায় অর্থ বার করতে করতে কাউন্সিলর জিজ্ঞাসা করে, এখানে তার খারাপ লাগছে কিনা। বেসামরিক পোশাক পরা নিরস্ত্র মোটা লোকটির দিকে বাঁকা চোখে ঘৃণা ভরে তাকায় হাজি মুরাদ, কিন্তু কোন জবাব করে না। দোভাষী আবার প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে।

ওকে বলুন যে ওর সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না। অর্থটা আমায় দিতে বলুন। এই কথা বলে অর্থ গুনবার জন্য হাজি মুরাদ টেবিলের পাশে বসে পড়ে।

হাজি মুরাদের প্রাত্যহিক ভাতা পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা। কিরিলভ দশটি করে স্বর্ণমুদ্রা এক এক ভাগে রেখে সাতটি ভাগ করে হাজি মুরাদের দিকে ঠেলে দেয়। হাজি মুরাদ মুদ্রাকটি সির কাজীয় কুর্তার পকেটে পুরে উঠে দাঁড়ায় এবং নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে কাউন্সিলরের টাকে একটি চাপড় দিয়ে রওনা হয়।

কাউন্সিলর লাফিয়ে ওঠে এবং দোভাষীকে বলবার হুকুম করে যে তার সঙ্গে এই রকম আচরণ করবার দুঃসাহস যেন হাজি মুরাদের না হয়; কেননা তার পদ-মর্যাদা কর্নেলের সমান।

ভারপ্রাপ্ত অফিসারও সায় দেয়; কিন্তু হাজি মুরাদ শুধু ঘাড় নেড়ে জানায় যে সে জানে। তারপর সে বেরিয়ে যায়।

ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলে, ওর সঙ্গে কি করা যায় বলুন! একটু কিছু হলেই হয়ত বুকে ছুরি বসিয়ে দিল! ব্যস! ও সব জানোয়ারের সঙ্গে কথা বলা যায় না! দেখছি, লোকটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই দুটি মুখ ঢাকা গুপ্তচর পাহাড় থেকে আসে। ভারপ্রাপ্ত অফিসার তাদের হাজি মুরাদের ঘরে নিয়ে যায়। এদের একজন বেশ নাদুস-নুদুস নোংরা এক তাভলিনিয়ান, অপরজন শীর্ণকায় এক বৃদ্ধ। তারা কোন সুখবর আনতে পারে নি। হাজি মুরাদের যে সব বন্ধু তার পরিবারের উদ্ধারের আয়োজন করছিল, শামিলের ভয়ে এখন তারা সরাসরি অস্বীকার করছে। শামিল ভয় দেখিয়েছে যে হাজি মুরাদকে যারা সাহায্য করবে তাদের সে ভয়ানক শাস্তি দেবে। গুপ্তচরের কথা শুনে হাজি মুরাদ হাঁটুর উপর কনুই ভর করে বসে থাকে এবং পাগড়িপরা মাথা হেঁট করে অনেকক্ষণ নীরবে ভাবে।

গভীরভাবে চিন্তা করছিল হাজি মুরাদ। সে জানে যে শেষবারের মত সে বিষয়টি সম্পর্কে বিবেচনা করছে এবং যাহোক একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতেই হবে। অনেক পরে মাথা তুলে সে গুপ্তচরদের প্রত্যেককে এক একটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে বলে, যাও।

কি জবাব দেব?

জবাব আল্লার ইচ্ছা……যাও!

চর দুটি চলে যায়। কিন্তু হাজি মুরাদ হাঁটুর উপর কনুই রেখে তেমনি ভাবেই কার্পেটে বসে থাকে। অনেকক্ষণ এই ভাবে বসে সে ভাবে।

কি করি? শামিলের কথায় বিশ্বাস করে ফিরে যাব? ও ব্যাটা ধূর্ত শেয়াল, আমায় প্রতারণা করবে। প্রতারণা না করলেও অমন মিথ্যাবাদীর কাছে নতি-স্বীকার করা অসম্ভব। নিশ্চয় অসম্ভব……আমি যখন রুশপক্ষে যোগ দিয়েছি তখন তো কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। তাভলিনিয়ান একটা উপকথা মনে পড়ে হাজি মুরাদের : ধরা পড়ে একটা বাজ পাখী মানুষের মধ্যে বাস করে এবং কিছুদিন পরে আবার পাহাড়ে নিজের জাতের মধ্যে ফিরে যায়। গলায় তার ঘণ্টা বাঁধা ছিল; অন্যান্য বাজ পাখীরা তাকে দলে নিতে অস্বীকার করে। বলে, যারা তোমার গলায় রূপোর ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছে তাদের দলে ফিরে যাও। আমাদের কোন ঘণ্টা নেই। বাজপাখীটি বাড়ী ছেড়ে গেল না। তখন আর সবাই মিলে তাকে ঠুকরে মেরে ফেলে।

হাজি মুরাদ ভাবে, ওরাও এমনিভাবে আমায় ঠুকরে মেরে ফেলবে। তাহলে কি এইখানে থেকে রুশ জারের জন্য গোটা ককেসিয়া জয় করে সম্মান পুরস্কার ধনসম্পদ অর্জন করব?

ভরন্তসভের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং তার অযাচিত প্রশংসার কথা মনে করে ভাবে, তা করা যেতে পরে। কিন্তু এখুনি

একটা সিদ্ধান্ত করতে হবে, নাহলে শামিল আমার পরিবারকে হত্যা করে ফেলবে।

সে-রাতে আর ঘুম হল না। সারারাত বসে চিন্তা করল।

দুপুর রাতে সে মনস্থির করে ফেলে। সিদ্ধান্ত করে যে পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে অনুগত আভরদের নিয়ে সে ভেদেনোয় ঢুকে পড়বে। হয় মৃত্যু, না হয় পরিবারের উদ্ধার। পরিবার উদ্ধার করার পর সে রুশপক্ষে ফিরে আসবে কিম্বা কুজনাখে পালিয়ে গিয়ে শামিলের সঙ্গে লড়াই করবে, সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করল না। তার প্রথম লক্ষ্য রুশদের হাত থেকে পাহাড়ে পালিয়ে যাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তার পরিকল্পনা করে ফেলে।

বালিশের তলা থেকে কালো বেশমতটা বার করে গায়ে জড়িয়ে সে অনুচরদের ঘরে যায়। তারা থাকে হলের ওধারে। হল ঘরে ঢুকতেই সদর দরজা খোলা ছিল বলে চাঁদের আলোকো-জ্জল শিশির-ঝরা রাত্রির স্নিগ্ধতা তাকে ঘিরে ধরে। বাগানে থেকে কয়েকটা নাইটিংগেলের শিশও কানে আসে।

হল ঘর পার হয়ে সে অনুচরদের ঘরের কপাট খোলে। সে ঘরে কোন আলো নেই। শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো পড়েছে জানালায়। ঘরখানার একপাশে একটা টেবিল ও চেয়ার। অনুচরদের মধ্যে কেউ কার্পেটের উপর কেউ বা বোরকা বিছিয়ে পড়ে আছে। খানেফি বাইরে ঘোড়ায় কাছে থাকে। কপাট

খোলার শব্দ গামজালোর কানে আসে। উঠে ফিরে চেয়ে হাজি মুরাদকে দেখতে পায়। চিনতে পেরে সে আবার শুয়ে পড়ে। এলদার তার পাশেই শোওয়া। লাফ দিয়ে উঠে সে প্রভুর আদেশের আশায় বেশমত পরতে থাকে। খান মহমা এবং বাটার ঘুম ভাঙল না। হাজি মুরাদ যে বেশমতটা নিয়ে এসেছিল সেটা সে টেবিলের উপর রাখে। জামার মধ্যে সেলাই করা স্বর্ণ-মুদ্রার জন্য ঠক করে একটা আওয়াজ হয়।

আজকেই যে কটা মুদ্রা পাওয়া গেছে সে-কটা এলদারের হাতে দিয়ে হাজি মুরাদ বলে, এ কটাও সেলাই করে রাখ। এলদার মুদ্রা কটি নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের আলোয় গিয়ে ছোরার তলা থেকে ছোট্ট একখানা ছুরি বার করে বেশমতের লাইনিং খুলতে আরম্ভ করে। গামজালো এই সময় উঁচু হয়ে পায়ের পর পা তুলে বসে।—শোনো গামজালো, সবাইকে রাইফেল পিস্তল পরীক্ষা করে গোলাগুলি তৈরী রাখতে বলে দাও। কাল আমরা অনেক দূরে যাব। হাজি মুরাদ বলে। কার্তুজ ও বারুদ দুটোই আছে। সব ঠিক থাকবে। গামজালো জানায়। গরগর করে গলায় একটা দুর্বোধ্য শব্দ করে গামজালো। সে বুঝতে পারে হাজি মুরাদ কেন রাইফেলে টোটা ভরে রাখতে বলেছে। প্রথম দিন থেকে তার একমাত্র কামনা, কেমন করে যতজন সম্ভব রুশকে ছোরা মেরে আবার পাহাড়ে পালিয়ে যাবে। প্রতিদিন এই আগ্রহ বেড়েছে। এখন সে বুঝতে পারে যে হাজি মুরাদের ইচ্ছাও তাই। কাজেই সে আজ খুশি।

হাজি মুরাদ চলে যাবার পর গামজালো অন্যান্য সাথীদের ডেকে তোলে এবং সারারাত সবাই মিলে রাইফেল, পিস্তল, চকমকি পরীক্ষা করে কাটিয়ে দেয়। যা খারাপ হয়ে গেছে সে সব বদলে নেয়……প্যানের উপর ছিটিয়ে দেয় টাটকা বারুদ ……প্রতিটি চার্জের জন্য উপযুক্ত পরিমান বারুদভরা তেলো ব্যাগের প্যাকেটে মোড়া টোটায় ছিপি লাগায়……শান দেয় তরোয়াল আর ছোরায় এবং তার ফলায় চর্বি মাখিয়ে রাখে।

ভোর হবার আগেই ওজু করবার জন্য জলের খোঁজে হল ঘরে আসে হাজি মুরাদ। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে নাইটিংগেল পাখীর গান পঞ্চমে চড়ে। বিরামহীন সে-গান এখন আরও স্পষ্ট আরও মুখর হযে ওঠে। আর অনুচরদের ঘর থেকে শোনা যায় পাথরের উপর ছোরা তরোয়াল ধার দেবার অবিরাম ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ।

টব থেকে খানিকটা জল নিয়ে হাজি মুরাদ ফিরে আসে। নিজের ঘরের দরজার সামনে ফিরে আসতেই ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজের মধ্যে খানেফির চড়া কণ্ঠস্বর কানে আসে। পরিচিত একটি গান গাইছে সে। হামজাদ নামে এক দ্‌জিগিতের কাহিনী গানটির বিষয়বস্তু। একদল সাহসী অনুচর নিয়ে সে রুশদের একপাল সাদা ঘোড়া দখল করে। এক রুশ প্রিন্স তেরেক নদীর ওপার অবধি অনুসরণ করে বিরাট অরণ্যের মত সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাকে ঘিরে ফেলে। হামজাদ তখন ঘোড়া-গুলো হত্যা করে তাই দিয়ে প্রাচীর সৃষ্টি করে এবং সেই বীভৎস

প্রাচীরের আড়াল থেকে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত রুশদের সঙ্গে লড়াই করে। যতক্ষণ একটি মাত্র টোটা এবং কোমরে ছোরা অবশিষ্ট ছিল ততক্ষণ সে লড়াই করে। মরণের আগে হামজাদ এক ঝাঁক উড়ন্ত পাখী দেখতে পায়। তখন তাদের ডেকে বলে :

উড়ে যা ওরে বিহঙ্গ, উড়ে যা আমাদের গৃহে !
মায়েদের বোনেদের আর রূপসী মেয়েদের বলিস—
গাজাভাতের জন্য লড়াই করে প্রাণ দিয়েছি আমরা !
কোন দিন কবরে আমাদের কেউ নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করবে না,
টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে বাঘে,
দাঁড়কাক আর শকুনে ছিঁড়ে নেবে চোখ !

বিষাদমাখা করুণ সুরে গানটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হাসি খুশি বাটা ভরাট গলায় তারস্বরে চীৎকার করে ওঠে : লয়া-ইল-লাইখা-ইল-আল্লাখ্ ! তারপর আবার সব নীরব হয়। চুক-চুক-চুক শব্দ, বাগানে নাইটিংগেলের শিশ্। অনুচরদের ঘরে শান দেবার একই ধরণের আওয়াজের মধ্যে কখন কখন শান দেবার পাথরের উপর দ্রুত লোহা চালিয়ে দেবার স্বনস্বনানি ছাড়া সব শব্দ থেমে যায়।

চিন্তাভাবনায় হাজি মুরাদ এত অন্যমনা ছিল যে কখন সে জগটা ভরতি করে ফেলেছে লক্ষ্য করতে পারেনি। মেজেয় জল গড়িয়ে পড়বার পর তার খেয়াল হয়। নিজের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করে মাথা ঝেঁকে সে ঘরে ঢোকে। হাত মুখ ধুয়ে সে নিজের অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা করে দেখে। তারপর বিছানায়

বসে। এখন আর কিছুই করবার নেই। ঘোড়ায় চড়ে বাইরে যেতে হলে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের অনুমতি চাই। সূর্য এখনও ওঠেনি ; অফিসার ঘুমিয়ে আছে।

তার জন্মের পর তার মা যে গানটি রচেছিলেন, খানেফির গান হাজি মুরাদকে সেই গানটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার বাবার উদ্দেশ্যে লেখা এ গানের কথা লোরিস মেলিকভকে বলেছে হাজি মুরাদ।

সহসা চোখের সামনে মায়ের ছবি ভেসে ওঠে। এখানে আসবার আগে মায়ের যে চুল-পাকা ভাঁজপরা ফোকলা মুখ দেখে এসেছে, সে মুখ নয়! ভেসে ওঠে স্বাস্থ্যবতী যুবতী প্রিয়দর্শিনী মায়ের ছবি, যখন পাঁচ বছরের বলিষ্ঠ হাজি মুরাদকে পিঠে-বাঁধা ঝুড়িতে ভরে অনায়াসে পাহাড় পেরিয়ে তিনি বাপের বাড়ী যেতেন।

বাল্যের এই স্মৃতি-প্রসঙ্গে নিজের প্রিয় পুত্র ইউসুফের কথা মনে পড়ে। তার মাথা সর্বপ্রথম সে নিজেই কমিয়ে দেয়। আজকে সেই ইউসুফ সুদর্শন দৃজিগিত। ভেসেলমেস ছেড়ে আসবার দিন ইউসুফের সঙ্গে তার শেষ দেখা। সেদিন তাকে যেমনটি দেখেছে তার কথা মনে করবার চেষ্টা করে। ইউসুফ তাকে ঘোড়া এনে দেয় এবং তার সঙ্গী হবার অনুরোধ জানায়। সাজপোশাক পরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সে প্রস্তুত ছিল। বলগা ধরে নিজের ঘোড়া সে নিজেই এনেছিল। তার সুদর্শন গোলাপী কচি মুখ এবং লম্বা পাতলা চেহারার মধ্য থেকে ফুটে বেরুচ্ছিল

নির্ভীকতা যৌবন ও আনন্দোচ্ছল জীবনের দীপ্তি। বাপের চেয়েও সে খানিকটা লম্বা। তরুণ বয়স সত্বেও ছেলের প্রশস্ত কাঁধ, লম্বা সরু কোমর, পৌরুষদীপ্ত অতিপ্রশস্ত উরু, লম্বা সবল বাহু এবং সর্বোপরি তার বলদৃপ্ত চলাফেরার ভঙ্গী হাজি মুরাদকে মুগ্ধ করত। পুত্রকে প্রশংসা করত সে।

তুমি থাকলেই ভাল হয়। বাড়ীতে এখন তুমি একলাই থাকবে। মা-ঠাকুরমা যত্ন নিও। হাজি মুরাদ বলেছিল। তখন তেজোদৃপ্ত গর্বোন্নত ভঙ্গীতে সোল্লাসে ইউসুফ জবাব দিয়েছিল যে তার প্রাণ থাকতে কেউ মা-ঠাকুরমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। এরপর বাপের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে সে নদী অবধি আসে। তারপর ফিরে যায়। মা স্ত্রী বা পুত্রের সঙ্গে তারপর হাজি মুরাদের আর দেখা হয়নি। এই পুত্রকেই শামিল আজ অন্ধ করে দিতে চাইছে। স্ত্রীর কি হবে সে কথা ভাববার কোন ইচ্ছাই হাজি মুরাদের হল না।

এই চিন্তা তাকে এতটা উত্তেজিত করে তোলে যে আর সে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না। লাফ দিয়ে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চটপট দরজার কাছে আসে এবং কপাট খুলে এলদারকে ডাক দেয়। সূর্য তখনও ওঠেনি, তবু অরুণাভায় সবদিক ফর্সা হয়ে গেছে। নাইটিংগেলগুলো গান গাইছে তখনও।

যাও, অফিসারকে বলে এসো যে আমি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাব। আর ঘোড়ায় জিন লাগাও!

বসে। এখন আর কিছুই করবার নেই। ঘোড়ায় চড়ে বাইরে যেতে হলে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের অনুমতি চাই। সূর্য এখনও ওঠেনি ; অফিসার ঘুমিয়ে আছে।

তার জন্মের পর তার মা যে গানটি রচেছিলেন, খানেফির গান হাজি মুরাদকে সেই গানটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার বাবার উদ্দেশ্যে লেখা এ গানের কথা লোরিস মেলিকভকে বলেছে হাজি মুরাদ।

সহসা চোখের সামনে মায়ের ছবি ভেসে ওঠে। এখানে আসবার আগে মায়ের যে চুল-পাকা ভাঁজপরা ফোকলা মুখ দেখে এসেছে, সে মুখ নয়! ভেসে ওঠে স্বাস্থ্যবতী যুবতী প্রিয়দর্শিনী মায়ের ছবি, যখন পাঁচ বছরের বলিষ্ঠ হাজি মুরাদকে পিঠে-বাঁধা ঝুড়িতে ভরে অনায়াসে পাহাড় পেরিয়ে তিনি বাপের বাড়ী যেতেন।

বাল্যের এই স্মৃতি-প্রসঙ্গে নিজের প্রিয় পুত্র ইউসুফের কথা মনে পড়ে। তার মাথা সর্বপ্রথম সে নিজেই কমিয়ে দেয়। আজকে সেই ইউসুফ সুদর্শন দ্জিগিত। ভেদেনমেস ছেড়ে আসবার দিন ইউসুফের সঙ্গে তার শেষ দেখা। সেদিন তাকে যেমনটি দেখেছে তার কথা মনে করবার চেষ্টা করে। ইউসুফ তাকে ঘোড়া এনে দেয় এবং তার সঙ্গী হবার অনুরোধ জানায়। সাজপোশাক পরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সে প্রস্তুত ছিল। বলগা ধরে নিজের ঘোড়া সে নিজেই এনেছিল। তার সুদর্শন গোলাপী কচি মুখ এবং লম্বা পাতলা চেহারার মধ্য থেকে ফুটে বেরুচ্ছিল

নির্ভীকতা যৌবন ও আনন্দোচ্ছল জীবনের দীপ্তি। বাপের চেয়েও সে খানিকটা লম্বা। তরুণ বয়স সত্ত্বেও ছেলের প্রশস্ত কাঁধ, লম্বা সরু কোমর, পৌরুষদীপ্ত অতিপ্রশস্ত উরু, লম্বা সবল বাহু এবং সর্বোপরি তার বলদৃপ্ত চলাফেরার ভঙ্গী হাজি মুরাদকে মুগ্ধ করত। পুত্রকে প্রশংসা করত সে।

তুমি থাকলেই ভাল হয়। বাড়ীতে এখন তুমি একলাই থাকবে। মা-ঠাকুরমা যত্ন নিও। হাজি মুরাদ বলেছিল। তখন তেজোদৃপ্ত গর্বোন্নত ভঙ্গীতে সোল্লাসে ইউসুফ জবাব দিয়েছিল যে তার প্রাণ থাকতে কেউ মা-ঠাকুরমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। এরপর বাপের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে সে নদী অবধি আসে। তারপর ফিরে যায়। মা স্ত্রী বা পুত্রের সঙ্গে তারপর হাজি মুরাদের আর দেখা হয়নি। এই পুত্রকেই শামিল আজ অন্ধ করে দিতে চাইছে। স্ত্রীর কি হবে সে কথা ভাববার কোন ইচ্ছাই হাজি মুরাদের হল না।

এই চিন্তা তাকে এতটা উত্তেজিত করে তোলে যে আর সে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না। লাফ দিয়ে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চটপট দরজার কাছে আসে এবং কপাট খুলে এলদারকে ডাক দেয়। সূর্য তখনও ওঠেনি, তবু অরুণাভায় সবদিক ফর্সা হয়ে গেছে। নাইটিংগেলগুলো গান গাইছে তখনও।

যাও, অফিসারকে বলে এসো যে আমি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাব। আর ঘোড়ায় জিন লাগাও!

যুদ্ধের কাব্যই বাটলারের জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা। শুধু চাকুরীর ক'ঘণ্টাই নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও সে এই চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকত। সিরকাজীয় পোশাক পরে সে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াত এবং দু' দুবার বোগদানোভিচের সঙ্গে গোপন পাহারায় গিয়াছে। কিন্তু একবারও কোন লোক খুন করতে পারেনি কিম্বা কারও হদিস পায়নি। সাহসী বলে পরিচিত বোগদানোভিচের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও দোস্তী বাটলারের কাছে আনন্দদায়ক মনে হত। চড়া সুদে এক ইহুদির কাছ থেকে কর্জ করে সে দেনা শোধ করেছে। তার মানে অসুবিধাটা আরও কিছুদিন পেছিয়ে দিয়েছে কিন্তু সমাধান করতে পারেনি। নিজের অবস্থার কথা সে ভাবতে চায় না, বিস্মৃতি খোঁজে যুদ্ধের কাব্য আর মদের মধ্যে। প্রতিদিন সে বেশী করে মদ্যপান করে এবং প্রতিদিনই নৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। আগেকার চরিত্রবান যোসেফ আর নেই। মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার সঙ্গে তার ভদ্র ব্যবহারও লোপ পেয়েছে। আজকাল সে অতি কুৎসিত ভাবে প্রেম নিবেদন করে এবং কঠোর বাধা পেয়ে বিস্মিত ও লজ্জিত হয়।

এপ্রিলের শেষাশেষি কেল্লায় নতুন একদল সৈন্য আসে। এই সৈন্যদল নিয়ে বারিয়াতিনস্কি সরাসরি চেচনিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত করে। এ পথ ইতিপূর্বে দুর্লঙ্ঘ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এদের মধ্যে দুটি কাবারদা কোম্পানী ছিল। ককেসাসের রীতি অনুসারে কুরিন কোম্পানীগুলো তাদের

অতিথি হিসাবে গ্রহণ করেছে। সেনা ব্যারাকে এদের থাকতে দেওয়া হয়। সান্ধ্য ভোজনের সময় তাদের শুধু গমের পরিজ এবং গোমাংসই দেওয়া হত না, সঙ্গে ভোদকাও থাকত। নবাগত অফিসারদের থাকতে দেওয়া হয় কুরিন রেজিমেণ্টের অফিসারদের সঙ্গে। এবং স্বভাবতই সাবেক অফিসাররা নবাগত-দের ডিনার দিয়ে আপ্যায়ন করে। রেজিমেণ্টের গাইয়েরা গান গায়; তারপর মদ্যপান করে ভোজসভা সাঙ্গ হয়। মেজর পেত্রভ এমন মাতাল হয়ে পড়ে যে তার লাল রঙ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে যায়। চেয়ারে বসে নেশার ঘোরে সে তরোয়াল বার করে কাল্পনিক শত্রু বধ করে। এক একবার দিব্যি করে, আবার হেসে ওঠে। একবার কাউকে জড়িয়ে ধরছে আবার তার প্রিয় গানের তালে তালে নাচছে ঃ

অনেকদিন আগে
হাঙ্গামা শুরু করে শামিল।
ট্রাই, রাই, রাটাটাই
বহু বছর আগে ভাই!

বাটলারও ছিল সেখানে। এর মধ্যেও সে যুদ্ধের কাব্য খোঁজে, কিন্তু মনে মনে মেজরের জন্য দুঃখবোধ করে। তাকে থামান অসম্ভব। নিজের মাথায় নেশার ঝাঁঝ টের পেয়ে বাটলার ঘর ছেড়ে সোজা বাড়ী চলে যায়।

চাঁদের আলোয় সাদা বাড়ীগুলো এবং রাস্তার পাথর ঝলমল করছে। আলোর এমনি বান ডেকেছে যে প্রতিটি নুড়ি, প্রতিটি

খড় এবং ধূলোর ঢিবি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই মাথায় শাল জড়ান মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার সঙ্গে দেখা হয়। প্রেম-প্রত্যাখানের পর মারিয়াকে এড়িয়ে চলেছে বাটলার। কেমন লজ্জা-লজ্জা করত। কিন্তু এই চাঁদের আলোয় নেশার মৌতাতে তার দেখা পেয়ে বাটলার খুশিই হয় এবং আর একবার চেষ্টা করে দেখবার মনস্থ করে। জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছ?

হাসিমুখে মারিয়া জবাব দেয়, কেন, আমার বুড়োকে দেখতে। অন্তর থেকেই বাটলারকে প্রত্যাখ্যান করেছে মারিয়া। তার আর নড়চড় হবে না। তবু বাটলার যে তাকে এড়িয়ে চলছে এও তার ভাল লাগে না।

কেন তার জন্য চিন্তা করছ? এখুনি এসে পড়বে।

সত্যি আসবে?

না আসতে পারে পৌঁছে দিয়ে যাবে!

এই রকম অবস্থা! ভাল নয়!···তাহলে তুমি বলছ যাবার দরকার নেই!

আমার তো তাই মত। চল বাড়ী ফিরে যাই।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা তখন বাড়ীর দিকে ফিরে বাটলারের পাশাপাশি হাঁটে। চাঁদের আলো এত উজ্জ্বল যে তাদের মাথার ছায়ার চারিপাশে যেন একটা আভা পড়ছে বলে মনে হয়। এই আভাটার দিকে চেয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাটলার ভাবছিল যে আবার মারিয়াকে বলবে যে আগের মতই সে তাকে পছন্দ করে। কিন্তু কি করে শুরু করা যায় বুঝে উঠতে পারছিল না।

মারিয়া তার কথা বলার প্রতীক্ষা করে। এইভাবে হেঁটে দুজনেই প্রায় বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়ে। এই সময় জনকয়েক ঘোড়সওয়ার মোড় ঘুরে কাছে আসে। দুটি অনুচর সহ এক অফিসার এল।

একপাশে সরে গিয়ে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা জিজ্ঞাসা করে, এই সময় কে আসছে? চাঁদটি সওয়ারদের পেছনে। কাজেই খুব কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত সওয়ারদের মুখ চেনা গেল না। অফিসারটির নাম পেতর নিকোলায়েভিচ কামেনেভ। এককালে মেজরের অধীনে কাজ করছে। মারিয়াও চেনে তাকে।

অফিসারকে সম্বোধন করে মারিয়া বলে, পেতর নিকোলায়েভিচ নাকি?

হাঁ। কামেনেভ বলে।—আরে বাটলার যে, কেমন আছ? এখনও ঘুমোওনি যে! মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার সঙ্গে বেড়াচ্ছ নাকি? সরে পড় হে! মেজর দেখতে পেলে কেলেঙ্কারি হবে। সে কোথায়?

কেন, ঐখানে···শুনছ না? যেদিন থেকে গান ও তুলুম-বাসের (এক ধরনের ভেরি) আওয়াজ আসছে সেইদিকে আঙুলের ইশারা করে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা বলে।

সেকি? নিজের খরচায় মদ খেয়ে তোমাদের লোকজন খুব হুল্লোর করছে নাকি?

হাসাভ-উর্ত থেকে কিছু অফিসার এসেছে কিনা, তাদের জন্য ভোজ দেওয়া হয়েছে।

আঃ, তা ভাল। ঠিক সময়েই এসেছি···কিন্তু মেজরের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার যে!

কাজ আছে? বাটলার জিজ্ঞাসা করে।

হাঁ, একটু কাজ আছে বই কি?

ভাল না মন্দ?

যে যা মনে করে! আমাদের পক্ষে ভাল কিন্তু অন্য লোকের পক্ষে খারাপ। হেসে ওঠে কামেনেভ।

কথা বলতে বলতে এই সময় তারা মেজরের বাড়ীর সামনে এসে পড়ে। কামেনেভ একজন কজাককে ডেকে বলে, চিখিরেভ, এদিকে এস!

একটি দন কজাক এগিয়ে আসে। তার পরনে সাধারণ দন কজাকের পোশাক। গায় ঢিলে বড় জামা, পায়ে উঁচু গোড়ালির বুট—পেছনে স্যাডল্-ব্যাগ।

কামেনেভ ঘোড়া থেকে নেমে বলে, হাঁ, জিনিসটা বার কর তো!

কজাকটি ঘোড়া থেকে নামে এবং স্যাডল-ব্যাগ থেকে একটা থলে খুলে আনে। কামেনেভ তার হাত থেকে থলেটা নিয়ে ভেতরে হাত দেয়।

একটা নতুন জিনিস দেখবে নাকি? মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা, ভয় পাবে না তো?

ভয় পাব কেন? সে বলে ওঠে।

এই গ্যাখ! থলের মধ্য থেকে মানুষের একটা ছিন্ন মুণ্ড বার

করে চাঁদের আলোয় তুলে ধরে কামেনেভ বলে—চিনতে পার ?

মুণ্ডটির মাথা কামান, টানা ভুরু এবং গোঁফ-দাড়ি খাটো করে ছাঁটা। একটি চোখ বিস্ফারিত—অপরটি আধবোজা। কামান মাথার খুলি দুভাগ করা। ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় নয়। নাসায় জমাট রক্তের চাপ। রক্তমাখা একখানা তোয়ালে দিয়ে গলাটা জড়ান। মাথার উপর বহু ক্ষতচিহ্ন সত্বেও নীলচে ঠোঁটে তখনও শিশুসুলভ প্রসন্নভাব ফুটে বেরুচ্ছে।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা বারেকের জন্য মুণ্ডটির দিকে তাকায়, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নীরবে ঘরের মধ্যে চলে যায়।

বাটলার এই কাটা মুণ্ড থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনায় বহু সন্ধ্যা যার সঙ্গে কেটেছে এ সেই হাজি মুরাদের ছিন্নমুণ্ড।

একি ? কে ওকে বধ করল ? সে জিজ্ঞাসা করল।

পালাবার তালে ছিল, কিন্তু ধরা পড়ে যায়। কামেনেভ বলে। মুণ্ডটা কজাকটিকে ফিরিয়ে দিয়ে সে বাটলারের সঙ্গে ঘরে ঢুকে যায়। বলে, বীরের মত মরেছে !

ব্যাপার কি বল না !

দাঁড়াও। মেজর আসুন, সব বলছি। এইজন্যই পাঠিয়েছে আমাকে। সব কটি কেল্লা ও আউলে ঘুরে ঘুরে দেখাতে হবে।

মেজরকে সংবাদ দেওয়া হয়। তারই মত মাতাল আর দুটি অফিসারকে নিয়ে সে আসে এবং কামেনেভকে জড়িয়ে ধরে।

কানেনেভ বলে, হাজি মুরাদের কাটা মুণ্ড এনেছি !

যাঃ !……মরেছে ?

হাঁ, পালাবার চেষ্টা করেছিল।

আমি বরাবর বলে এসেছি, ও ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করবে ! ……সেটা কোথায় ? মানে মুণ্ডটা !……দেখাও তো !

কজাকটিকে আবার ডাকা হয়। মুণ্ড ভর্তি থলেটি নিয়ে সে আসে। ছিন্নমুণ্ডটি আবার বার করা হয় এবং মাতালের দৃষ্টিতে মেজর তার দিকে চেয়ে থাকে। বলে, তাহলেও লোকটা ভাল ছিল। আমি চুমু খাব !

যা বলেছেন! বেশ উন্নত শির! অফিসারদের একজন বলে।

একে একে সবাই দেখবার পর মুণ্ডটি কজাকটিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মেজেয় ঠোকর না লাগে এইভাবে আস্তে আস্তে সে আবার মুণ্ডটি থলেয় ভরে।

না !……আমি চুমু খাবোই ! লোকটা আমায় একখানা তরোয়াল দিয়েছে। মেজর চেঁচিয়ে ওঠে।

বাটলার বারান্দায় চলে যায়। মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা সিঁড়ির মাঝামাঝি বসেছিল। বাটলারের দিকে চেয়ে ক্রুদ্ধভাবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

কি হল মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা ? বাটলার জিজ্ঞাসা করে।

তোমরা সবাই জহ্লাদ !……আমার ঘেন্না হয় ! সত্যিই তোমরা খুনী ! উঠে দাঁড়ায় মারিয়া।

কি বলা যায় ঠাহর করতে না পেরে বাটলার বলে ওঠে, যে কারও এ দশা হতে পারে। এ যে যুদ্ধ!

যুদ্ধ, না? যুদ্ধই বটে!……জহ্লাদ……জহ্লাদ! মরা মানুষকে কোথায় মাটিতে পুঁতে রাখবে, তা না সবাই কাটা মুণ্ড দেখে হি হি করে হাসছে! সত্যি, জহ্লাদ তোমরা! সিড়ি বেয়ে নেমে পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে যায় মারিয়া।

বাটলার ফিরে এসে কামেনেভের কাছে ঘটনার বিবরণ শুনতে চায়। কামেনভও শোনায়। ঘটনাটি এই ঃ

সহরের কাছে-পিঠে হাজি মুরাদকে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে দেওয়া হত; কিন্তু কখনও কজাক প্রহরী ছাড়া যাবার হুকুম ছিল না। নুখাতে সবশুদ্ধ জন বিশেক প্রহরী ছিল। দশজন অফিসারদের সেবা করত। কাজেই উপরিওলার হুকুম অনুযায়ী হাজি মুরাদের সঙ্গে দশজন পাঠালে ঐ দশজনকেই একদিন অন্তর যেতে হয়। কাজেই প্রথম দিন দশজন পাঠাবার পর পাঁচজন করে পাঠাবার সিদ্ধান্ত করা হয় এবং হাজি মুরাদকে পাঁচজন অনুচর নিয়ে বেরুতে নিষেধ করা হল। কিন্তু পঁচিশে এপ্রিল পাঁচজনকে নিয়েই সে বেরিয়ে পড়ে। পাঁচজন সঙ্গীই যাচ্ছে দেখে কমাণ্ডারের সন্দেহ হয় এবং সে বলে যে সব অনুচর নিয়ে যাবার নিষেধ আছে। হাজি মুরাদ কথাটা না শুনবার ভাণ করে। কমাণ্ডারও আর পীড়াপীড়ি করল না।

কজাকদের সঙ্গে নাজারভ নামে এক নন-কমিশনড অফিসার ছিল। বীরত্বের জন্য সে সেণ্ট জর্জ ক্রশ পেয়েছিল। টাটকা

গোলাপের মত স্বাস্থ্যবান চুল কটা যুবক নাজারভ। 'ওল্ড বিলিভার' সম্প্রদায়ের এক গরীব গৃহস্থের সন্তান। পিতৃ-হীন সংসারে বড় হয়েছে এবং আজকে বুড়ো মা, তিন বোন আর দুই ভাইয়ের ভরণপোষণ করছে।

খেয়াল রেখ নাজারভ, কাছাকাছি থাকবে। কমাণ্ডার হুঁসিয়ার করে দেয়।

ঠিক আছে স্যর! নাজারভ বলে। রেকাবে পা দিয়ে চমৎকার একটা তেজীয়ান কটা ঘোড়ায় চড়ে সে পিঠের রাইফেলটা ঠিক করে নেয় এবং কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। চারজন কজাক তার অনুগমন করে। লম্বা লিকলিকে ফেরাপন্তভ পাকা চোর ও লুঠেরা। সে-ই গামজালোর কাছে বারুদ বিক্রী করেছে। ইগনাতভ পরিশ্রমী কৃষক। নিজের শক্তির বড়াই করত। বয়স নেহাৎ কম নয় আর সামরিক চাকুরীর মেয়াদও শেষ হয়ে এসেছে। কাহিল মিশখিনকে সবাই উপহাস করত। আর তরুণ সুকেশ পেত্রাকভ যেমন হাসিখুশি তেমনি অমায়িক। মায়ের একমাত্র ছেলে।

সেদিন সকালে কুয়াশা ছিল। পরে কেটে যায়; আর ফুটন্ত পল্লব, কচি ঘাস, শস্যের অঙ্কুর আর রাস্তার বাঁ পাশের খরস্রোতা নদীর ছোট ছোট ঢেউ রোদে ঝলমল করতে থাকে।

আস্তে আস্তে চলে হাজি মুরাদ। অনুচর ও কজাক প্রহরীরা পেছনে চলে। কেল্লার ওধারের পথ বরাবর হেঁটে হেঁটে চলে তারা। মাথায় ঝুড়িওলা মেয়েরাও চলেছে পথ দিয়ে।

ক্যাঁচ কোঁচ করে চলেছে মোষের গাড়ি, আর দু চারজন সৈনিকও যাচ্ছে গাড়ি চালিয়ে। মাইল দেড়েক এগিয়ে হাজি মুরাদ তার সাদা কাবারদা ঘোড়াটাকে ইঙ্গিত করে; সঙ্গে সঙ্গে কদমে ছোটে ঘোড়াটি। অনুচর ও কজাক প্রহরীরাও তার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য জোরে ঘোড়া ছোটাতে বাধ্য হয়।

ফেরাপন্তভ বলে, আঃ, ওর ঘোড়াটা কি চমৎকার! যদি দুশমন হত তো এখনও আমি ওকে ধরাশায়ী করতে পারতাম।

যা বলেছ সাথী! তিফলিসে ঐ ঘোড়াটার তিনশ রুবল দাম দিতে চাওয়া হয়েছিল।

আমি এখনও ওকে ছাড়িয়ে যেতে পারি। নাজারভ বলে।

তুমি ছাড়িয়ে যাবে? কখ্খনও না!

ক্রমেই হাজি মুরাদ অশ্বের গতি দ্রুততর করে।

হেই কুনাক, ওভাবে ছুটো না। আস্তে চল! হাজি মুরাদকে ধরবার জন্য ঘোড়া ছুটিয়ে হেঁকে বলে নাজারভ।

হাজি মুরাদ পেছন ফিরে তাকায় কিন্তু কথা বলে না। ঐ একই ভাবে চলতে থাকে।

ইগনাতভ বলে, ওহে, শয়তানগুলোর নিশ্চয় কোন মতলব আছে। দ্যাখ না, ক্রমেই কেমন দূরে সরে যাচ্ছে!

এমনিভাবে আরও মাইল খানেক তারা পাহাড়ের দিকে এগোয়।

কথা শোন বলছি, ও চালাকি চলবে না। হেঁকে বলে নাজারভ।

এবারে হাজি মুরাদ কোন জবাবও দিল না কিম্বা ফিরেও চাইল না। বরং অশ্বের গতি আরও দ্রুততর করল।

দমবাজ! পালাতে হবে না! নাজারভও ঘোড়ার গতি দ্রুততর করে দেয়। তেজীয়ান কটা ঘোড়াটাকে জোরসে চাবুক মেরে রেকাবের উপর সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সে ঝড়ের বেগে হাজি মুরাদের অনুসরণ করে।

এমন পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল আকাশ, এমনি নির্মল বাতাস যে নাজারভের অন্তর আনন্দে নেচে ওঠে, মনে হয় যেন চমৎকার তেজীয়ান ঘোড়াটার সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে। সমতল পথ দিয়ে হাজি মুরাদের পেছনে সে উড়ে চলে যেন। মর্মান্তিক কি ভীতিজনক কিছু ঘটবার বিন্দুমাত্র শঙ্কা তার মনে স্থান পায়নি। প্রতিপদে সে হাজি মুরাদের কাছে আসছে, এই আনন্দেই মশগুল নাজারভ।

তেজীয়ান ঘোড়াটার খুরের শব্দ শুনে হাজি মুরাদ আন্দাজ করে নেয় যে শিগগিরই তাকে ধরে ফেলবে। ডান হাত দিয়ে পিস্তল বার করে বাঁ হাতে রাশ টেনে সে ঘোড়ার গতি ঈষৎ শ্লথ করে। আগুয়ান অশ্বখুরের শব্দ শুনে তার কাবারদা ঘোড়াটাও উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

বারণ করছি শোনো! নাজারভ হেঁকে বলে এবং হাজি মুরাদের পাশাপাশি এসেই হাত বাড়িয়ে তার বলগা ধরতে যায়। কিন্তু বলগাটা ধরবার আগেই একটা গুলির আওয়াজ হয়! 'কি করছ?' বলে বুকচেপে চেঁচিয়ে ওঠে নাজারভ।

'পাকড়ো সাথী' বলেই টাল খেয়ে সে জিনের পর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

পাহাড়েরা আগেই হাতিয়ার বার করে কজাকদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে এবং তরোয়াল দিয়ে তাদের কোপায়।

নাজারভ তখন ঘোড়ার ঘাড়ের উপর ঝুলছে আর বাহনটি তার সাথীদের চারপাশে ঘুরছে। ইগনাতভের বাহনটি পা ভেঙে পড়ে যায়। দুটি পাহাড়ে ঘোড়া থেকে না নেমে তরোয়াল দিয়ে তার শির ও বাহু পৃথক করে কেটে ফেলে। সাথীদের সাহায্যের জন্য পেত্রাকভ এগিয়ে আসতেই পিঠে ও বগলে দুটি গুলি তাকে ঘায়েল করে। থলের মত ধুপ্ করে পড়ে যায়।

মিশখিন পেছন ফিরে কেল্লার দিকে ছুট দেয়। খানেফি ও বাটা তাকে তাড়া করে; কিন্তু ততক্ষণে সে এতদূরে চলে যায় যে তারা আর ধরতে পারল না। ধরা যাবে না বুঝতে পেরে খানেফি ও বাটা সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসে।

পেট-কাটা পেত্রাকভ চিৎ হয়ে আকাশর দিকে চেয়ে পড়ে আছে। মাছের মত শ্বাস নেবার চেষ্টা করছে মুমুর্ষু ছেলেটি।

তরোয়াল দিয়ে ইগনাতভকে সাবাড় করে নাজারভকেও এক কোপ দিয়ে ঘোড়া থেকে ফেলে দেয় গামজালো। নাজারভের ঘোড়াটা নিয়ে যাবার বড় ইচ্ছা ছিল খানেফির, কিন্তু হাজি মুরাদ নিষেধ করে এবং নিজে হুড় হুড় করে এগিয়ে যায়। মুরিদরাও উর্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে তার অনুসরণ করে।

নাজারভের ঘোড়াটা তাদের পেছু নেয়, কিন্তু সেটাকে ওরা তাড়িয়ে দেয়। নুখা থেকে মাইল ছয়েক দূরে যখন তারা ধান ক্ষেতের মধ্যে এসে পড়ে, স্থানীয় টাওয়ার থেকে একটা গুলি ছুড়ে বিপদের সংকেত করা হয়।

হাজি মুরাদের পলায়নের সংবাদ শুনে কেল্লার সেনাধ্যক্ষ হায় হায় করে ওঠে। মিশখিনের বিবরণ শুনে মাথায় হাত দিয়ে বলে, হে ভগবান! করেছে কি? ডুবিয়েছে আমাকে! দস্যু ব্যাটাদের পালাতে দিল!

অমনিই সর্বত্র বিপদসূচক বার্তা পাঠান হয়। পলাতকদের সন্ধানে শুধু কজাকদেরই পাঠান হল না, কাছাকাছির আউলের যত গণফৌজের লোক পাওয়া গেল তাদেরও নিয়োগ করা হয়। জীবিত কি মৃত অবস্থায় হাজি মুরাদকে ধরে আনতে পারলে হাজার রুব্‌ল পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। সানুচর হাজি মুরাদ পালিয়ে যাবার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ভার-প্রাপ্ত অফিসার দুশো লোক নিয়ে উর্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পলাতকদের খোঁজে বেরোয়।

উঁচু রাস্তা দিয়ে মাইল কয়েক এগোবার পর হাজি মুরাদ ক্লান্ত ঘোড়াটা থামায়। ঘামে ভিজে সাদা বাহনটি পাংশুটে হয়ে গেছে।

রাস্তার ডানদিকে বেনার্দঝিক আউলের সাকলা আর মসজিদের মিনার দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকে মাঠ; তার ওধারে

নদী। পাহাড়ে যাবার পথ ডানদিকে হলেও হাজি মুরাদ বাঁয়ে ঘোরে। অনুমান করে, তার অনুসারীরা সুনিশ্চিত ডান দিকেই যাবে; আর সে এদিকে রাস্তা ছেড়ে আলাজান নদী পার হয়ে এমন পথে পড়বে যেখানে কেউ সন্দেহ করতে পারবেনা। তারপর রাস্তা ধরে সে বনের মধ্যে পড়বে এবং সেখান থেকে আবার নদী পার হয়ে পাহাড়ের দিকে যাবে।

এই সিদ্ধান্ত করে সে বাঁয়ে ঘোরে কিন্তু নদী অবধি যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ধান ক্ষেত পার হতে হবে একটি। বসন্তের বেনো জলে মাঠ থৈ থৈ করছে। এমন কাদা হয়েছে সে হাঁটু অবধি ঘোড়ার পা ডেবে যেতে চায়। হাজি মুরাদ এবং তার মুরিদরা তখন শুকনো মাটির খোঁজে একবার ডাইনে আবার বাঁয়ে ঘোরে। কিন্তু মাঠের সর্বত্রই জলকাদা প্যাচ প্যাচ করছে। আঁটাল মাটি থেকে ঘোড়াগুলো পা টেনে তুলছে আর বোতলের ছিপি খোলার মত পক্ পক্ শব্দ হচ্ছে। কয়েক পা চলেই তারা হাঁপায়। এইভাবে সন্ধ্যা অবধি চলে ঘোড়া ক'টি, তবু নদীতীরে পৌঁছোতে পারে না। ডানদিকে ঝুপসি গাছপালা ঢাকা এক ফালি উঁচু জমি। ক্লান্ত ঘোড়াকটাকে বিশ্রাম দেবার এবং ঘাস খাওয়াবার জন্য এই ঝোঁপের মধ্যেই রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত করে হাজি মুরাদ। অনুচরেরা সঙ্গে কিছু রুটি পনীর নিয়ে এসেছিল; সবাই মিলে তাই খাওয়া হয়। অবশেষে রাত্রি নেমে আসে। চাঁদ দেখা যাচ্ছিল এতক্ষণ, তাও পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে যায়। পাশাপাশি বহু নাইটিংগেল আছে,

ঝোঁপের মধ্যেও দুটো ছিল। হাজি মুরাদ এবং মুরিদরা যতক্ষণ নড়াচড়া করেছে পাখী দুটি চুপ করেই ছিল ; কিন্তু সাড়াশব্দ বন্ধ হতেই তারা ডাকাডাকি করে বনভূমি মুখর তোলে।

এদের প্রতিটি সাড়াশব্দের প্রতি কান খাড়া করে ছিল হাজি মুরাদ। নাইটিংগেলের গানও আপনা থেকেই তার কানে আসে। এই গান তাকে হামজাদের কাহিনী নি'য় রচিত গানটির কথা মনে করিয়ে দেয়। জল আনতে গিয়ে গত রাত্রে গানটি সে শুনেছে। এখন যে কোন মুহূর্তে সে হামজাদের অবস্থায় পড়তে পারে। মনে হয় তেমনিই একটা কিছু ঘটবে। সঙ্গে সঙ্গে সে গম্ভীর হয়ে পড়ে। বোরকা ছড়িয়ে সে ওজু করে নেয়। ওজু শেষ হতে না হতেই আগুয়ান একটা শব্দ তার কানে আসে। আশ্রয়ের দিকে ক্রমেই এগিয়ে আসছে শব্দটি। জলকাদা ভরা মাঠের মধ্যে বহু অশ্বখুরের শব্দ।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন হুঁশিয়ার বাটা অমনিই ঝোঁপের প্রান্তে ছুটে যায় এবং অন্ধকার ভেদ করে কালো কালো ছায়া দেখতে পায়। হেঁটে এবং ঘোড়ায় চড়ে আসছে লোকজন। খানেফিও অপরদিকে একই ধাঁচের ছায়া দেখে। জেলার সামরিক কমাণ্ডার কারগানভ আসছে গণসেনা নিয়ে।

হাজি মুরাদ ভাবে, তাহলে হামজাদের মতই আমরা লড়ব।

বিপদ-সঙ্কেত-ধ্বনি শুনে একদল গণফৌজ নিয়ে হাজি মুরাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে কারগানভ। কিন্তু তাদের কোন হদিস পায়নি। আশা ছেড়ে দিয়ে সে ফিরে যাচ্ছিল এমনি

সময় সন্ধ্যার মুখে এক বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হয়। তাকে জিজ্ঞাসা করে, সে কোন ঘোড়সওয়ার দেখেছে কিনা। বৃদ্ধ বলে যে দেখেছে—ধান ক্ষেতের মধ্যে জনাছয়েক ঘোড় সওয়ারকে দেখেছে এবং যে-বনে সে কাঠ কুড়োচ্ছিল শেষ অবধি তারা সেইখানেই ঢোকে। বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে কারগানভ আবার ফেরে এবং কাদার মধ্যে খুরের দাগ দেখে আন্দাজ করে যে হাজি মুরাদ এই পথেই গেছে। রাত্রে সে ঝোঁপটি ঘিরে রাখে এবং হাজি মুরাদকে জীবিত কি মৃত অবস্থায় বন্দী করার জন্য ভোর অবধি অপেক্ষা করে।

পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে বুঝে এবং ঝোঁপের মধ্যে পুরনো একটা খানা দেখে হাজি মুরাদ তার আড়াল থেকে শেষ পর্যন্ত লড়াই করবার সিদ্ধান্ত করে। সঙ্গীদের সে সঙ্কল্পের কথা জানায়। তারা সঙ্গে সঙ্গে ডালপালা কাটতে শুরু করে এবং ছোরা দিয়ে মাটি খুঁড়ে একটা ঢিবি তৈরী করে। হাজি মুরাদ নিজেও তাদের সঙ্গে খাটে।

ভোরের আলো দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গণসেনার কমাণ্ডার ঝোঁপের কাছাকাছি এগিয়ে এসে হাঁক দিয়ে বলে, হেই হাজি মুরাদ, আত্মসমর্পণ কর! আমরা সংখ্যায় অনেক বেশী আর তোমরা মাত্র কজন!

রাইফেলের গুলি এই আহ্বানের জবাব দেয়। খানা থেকে একটি ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে এবং একটা গুলি এসে একটি গণসেনার ঘোড়ার গায়ে লাগে। ঘোড়াটা টাল খেয়ে কাঁপতে

কাঁপতে পড়ে যায়। ঝোঁপের প্রান্তে দাঁড়ান গণসেনাদের রাইফেল থেকে তখন দুমদাম আওয়াজ শুরু হয়। সাঁ করে উড়ে গিয়ে তাদের গুলি গাছপালার ডাল পাতা ছিঁড়ে ফেলে, ঢিবিটির উপরেও আঘাত করে, কিন্তু খানার মধ্যের লোকজনের কোন অনিষ্ট করতে পারল না। গামজালোর ঘোড়াটা দল ছেড়ে খানিকটা দূরে ছিল বলে সেটার মাথায় একটা গুলি লাগে। ঘোড়াটি পড়ে গেল না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঝোঁপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে ছুটে ঘোড়াটি দলের কাছে গিয়ে তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে কচি ঘাস ভিজে যায়। গণসেনাদের কেউ যখন রুখে আসে হাজি মুরাদ এবং তার অনুচরেরা শুধু তখনই গুলি করে এবং কদাচিৎ তাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। তিনটি গণসেনা আহত হয়। বাকী আর সবাই তখন খানার দিকে রুখে এগোবার আশা ছেড়ে ক্রমেই হটে যেতে থাকে এবং দূর থেকে এলোপাথারি গুলি করে।

এইভাবে ঘণ্টা খানেক চলে। সূর্য গাছের আধাআধি ওঠে। হাজি মুরাদ তখন ভাবছে ঘোড়ায় চড়ে নদীর দিকে ছুট দেবে কিনা। এই সময় সদ্য-আগত বহুলোকের কলরব শোনা যায়। মেখতুলির হাজি আগা এসে যায় লোকজন নিয়ে। মাথা গুনতিতে প্রায় শ' দুয়েক হবে। হাজি আগা এক সময় হাজি মুরাদের কুনাক ছিল এবং তার সঙ্গে পাহাড়ে বাস করেছে। পরে সে রুশপক্ষে চলে যায়। হাজি মুরাদের সাবেক শত্রুর ছেলে আখমত খাঁও ছিল সঙ্গে।

কারগানভের মত হাজি আগাও প্রথমে হাজি মুরাদকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়, কিন্তু হাজি মুরাদ পূর্বের মতই গুলির মুখে জবাব দেয়। হাজি আগা তখন নিজের তরোয়াল বার করে হেঁকে বলে, আমার যত লোকজন আছ তরোয়াল বার কর। শতকণ্ঠে কলরব করে হাজি আগার লোকজন তখন ঝোঁপের মধ্যে ঢুকে পড়ে। গণসেনারাও ছুটে যায় বনের মধ্যে। কিন্তু পরিখার আড়াল থেকে তখন একটির পর একটি গুলি আসতে থাকে। তিনজন ধরাশায়ী হয়। আক্রমণকারী দল তখন বনের কিনারে দাঁড়িয়ে গুলি করতে শুরু করে। জনকয়েক এগিয়ে যায়, আর সবাই হাজি মুরাদ কি তার অনুচরদের গুলিতে কুপোকাত হয়। হাজি মুরাদের একটি লক্ষ্যও ভ্রষ্ট হয়নি। গামজালোরও একটি গুলি ব্যর্থ যায়নি। প্রতিটি গুলি লক্ষ্য ভেদ করছে দেখে প্রতিবারে সে সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে। খান মহমা খানার পারে বসে ইল-লায়লাখ-ইল আল্লা গাইছে আর এলোপাথারি গুলি করছে। তার গুলির প্রায় সব কটাই ব্যর্থ হচ্ছে। ছোরা হাতে নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার অধীর আগ্রহে এলদারের গোটা শরীর কাঁপছে। বারে বারে সে হাজি মুরাদের দিকে চাইছে আর খানার মধ্যে শুয়ে লক্ষ্যহীনের মত পটাপট গুলি ছুঁড়ছে। অস্তিন গুটিয়ে খানেফি এখানেও চাকরের মত খাটছে। হাজি মুরাদ এবং খান মহমা তাকে বন্দুক দিচ্ছে আর সে গাদনকাঠি দিয়ে সযত্নে তেলো র‍্যাগ মোড়া বুলেট ভরে দিচ্ছে এবং বারুদের টিন থেকে

শুকনো বারুদ ঢেলে দিচ্ছে প্যানের উপর। অন্যের মত বাটা খানার মধ্যে থাকেনি। সে ঘোড়া নিয়ে ছুটাছুটি করছে এবং তাদের নিরাপদ স্থান দেখে তাড়িয়ে নিচ্ছে। অনবরত সে চীৎকার করছে আর উদ্দেশ্যহীন ভাবে গুলি করছে। সে-ই প্রথম আহত হয়। গলায় একটা বুলেট লাগে এবং থুক করে রক্ত বমি করে সে বসে পড়ে গালাগাল দেয়। তারপর হাজি মুরাদ আহত হয়। একটা বুলেট তার কাঁধে বিঁধে বসে। বেশমতের লাইনিং থেকে খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে ক্ষতমুখ আটকে দিয়ে সে আবার গুলি করতে থাকে।

আসুন তরোয়াল নিয়ে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। তৃতীয়বার বলে এলদার। শত্রুর দিকে রুখে এগোবার জন্য সে পরিখা থেকে সামান্য মুখ উঁচু করে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই তার মাথায় একটা গুলি লাগে। টাল খেয়ে সে হাজি মুরাদের পায়ের উপর চিং হয়ে পড়ে যায়। হাজি মুরাদ ফিরে তাকায়। ভেড়ার মত সুন্দর চোখ ছুটি মেলে স্থির দৃষ্টিতে হাজি মুরাদের দিকে সে গভীরভাবে চেয়ে আছে। মুখ হাঁ না করেই সে শিশুর মত উন্মুখ ঠোঁট মোচড়াচ্ছে। হাজি মুরাদ তার তলা থেকে পা টেনে এনে গুলি করতে থাকে।

খানেফি তখন মৃত এলদারের পর ঝুঁকে তার কুর্তার টোটার পকেট থেকে অব্যবহৃত গোলাগুলি নিয়ে আসে।

খান মহমা তখনও গেয়ে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে গুলি করছে। ছুশমনরা তখন হৈ হুল্লোর করে এ ঝোঁপ থেকে ও

ঝোপে ছুটাছুটি করছে এবং প্রতি মুহূর্তেই কাছে এগিয়ে আসছে।

আর একটি বুলেট এসে এই সময় হাজি মুরাদের বাঁ কোঁখে লাগে। খানার মধ্যে সে শুয়ে পড়ে এবং আরও খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে ক্ষতমুখ আটকে দেয়। কোঁকের এই আঘাতটি প্রাণান্তকর। বেশ বুঝতে পারল যে মৃত্যু আসন্ন। অতি দ্রুত তখন একের পর এক স্মৃতি ও ছবি পলকের জন্য কল্পনায় উদয় হয়। একবার দেখে শক্তিশালী আব্বু নুতসল খাঁ ছোরা হাতে কাটা গাল নিয়ে শত্রুর দিকে রুখে এগোচ্ছে; আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে দুর্বল রক্তহীন ভরন্তসভের চতুর হাসি—তার ছোট ছোট কথাও যেন শুনতে পায়। তারপর মনে পড়ে পুত্র ইউসুফ ও স্ত্রী সোফিয়ার মুখ। আবার দেখে তার দুশমন অর্ধনিমীলিত চোখ শামিলের লাল দাড়িওলা বিবর্ণ মুখ। কিন্তু এর কোন ছবিই তার মধ্যে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে না। করুণা ক্রোধ কিম্বা কোন আগ্রহই সে বোধ করে না। তার মধ্যে যে প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, তার তুলনায় সব কিছুই তুচ্ছ বলে মনে হয়।

তবু যে কাজ শুরু করেছে তার বলিষ্ঠ দেহ সে কাজ বন্ধ করল না। শেষ শক্তি জড়ো করে সে ঢিবির আড়ালে উঠে দাঁড়ায় এবং যে লোকটি সরাসরি তার দিকে ছুটে আসছে তাকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলি করে। লক্ষ্য ব্যর্থ হল না। লোকটি পড়ে যায়। হাজি মুরাদ তখন খানা থেকে উঠে

আসে এবং খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছোরা হাতে নিয়ে সরাসরি শত্রুর দিকে এগোয়।

গোটা কয়েক গুলির আওয়াজ হয়। টলতে টলতে পড়ে যায় হাজি মুরাদ। সোল্লাসে চীৎকার করে জনকয়েক গণসেনা তার দিকে রুখে এগোয়। কিন্তু যে দেহ মৃত বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে সেটি আবার নড়ে ওঠে। প্রথমে নাঙ্গা কামান মাথাটি উঁচু হয়; তার পর হাত দিয়ে গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে গোটা দেহ খাড়া হয়। তাকে তখন এমন বীভৎস দেখায় যে আগুয়ান লোকজন থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু সহসা গোটা দেহ থরথর করে কেঁপে ওঠে এবং গাছ ছেড়ে দিয়ে সে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। গোটা শরীর কাটা থিসলের মত টান হয়ে যায়। আর নড়ে না।

না নড়লেও অনুভব শক্তি তখনও লোপ পায়নি।

হাজি আগা প্রথম এসে মস্ত বড় একখানা ছোরা দিয়ে তার মাথায় কোপ মারে। হাজি মুরাদের মনে হয়, কে যেন তার মাথায় হাতুড়ির বাড়ি মারল। কে বা কিসের জন্য করছে তা মালুম হল না। এর পরেই দেহের সঙ্গে তার সম্পর্ক লোপ পায়। আর কোন অনুভূতিই ছিল না। শত্রুরা যার উপর কোপ লাথি মারে তার সঙ্গে হাজি মুরাদ তখন সম্পর্কহীন।

হাজি আগা তখন লাশটির পিঠে পা রেখে দুই কোপে মুণ্ডটা কেটে ফেলে এবং রক্ত লেগে জুতো যাতে নষ্ট না হয়

সেদিকে হুঁশিয়ার থেকে পা দিয়ে ঠেলে মুণ্ডটি সরিয়ে আনে। গলার শিরা-উপশিরা থেকে ফিনকি দিয়ে তাজা খুনখারাবি রক্ত ছোটে, আর কাটামুণ্ড থেকে কালচে রক্ত গড়িয়ে ঘাস ভিজে যায়।

কারগানভ, হাজি আগা, আখমত খাঁ আর গনসেনারা তখন হাজি মুরাদ আর তার অনুচরদের লাশের চারপাশে জামায়েত হয়। খানেফি, খান মহমা আর গামজালোকে তারা বেঁধে নেয়। এবং সবাই মিলে বারুদের ধোঁয়া ভরা বনের মধ্যে বিজয়োল্লাস করে।

গোলা-গুলি চলবার সময় নাইটিংগেলের গান থেমে গিয়েছিল। এখন আবার তারা শিশ দিতে শুরু করে। প্রথমে খুব কাছের একটা ডেকে ওঠে, তাই শুনে দূরের অনেকে সাড়া দেয়।

চষা মাঠের মধ্যে ভাঙা থিসল গাছটা দেখে এই কাহিনীটিই আমার মনে পড়ে।

—মৃত্যুর পর প্রকাশিত—

